শিল্প সংস্কৃতি সংগ্রাম

ইব্রাহীম মন্ডল

শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতা

ইব্রাহীম মন্ডল

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতা

ইব্রাহীম মন্ডল

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

গ্রন্থস্বত্ব :লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০১

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৫

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স : ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ : ইব্রাহীম মন্ডল

ডিজাইন : মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য : ১৪০/- (একশত চল্লিশ) টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

SHILPO SONGSKRITI SOBBTA- Writter by Ibrahim Mondol. Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 140/- US $ 4/-

ISBN.984-70241-0081-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার স্ত্রী
খোন্দকার আখতারুন নেছা
ও
নতুন দুই কন্যা
মিসেস সায়লা রেজওয়ান ও
মিসেস সাবিনা আদনান
কে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

- কষ্ট থেকে পালিয়ে এসেছি (কাব্যগ্রন্থ)
- কার্টুনের কথা
- হাতে কলমে ক্যালিগ্রাফি

প্রকাশিতব্য

- ইসলামী শিল্পকলা ও ক্যালিগ্রাফি
- ছড়ায় ছড়ায় পাখ-পাখালি (ছড়া গ্রন্থ)
- রুমী ফেরদোসীর দেশে
- এসো ছবি আঁকি।

www.pathagar.com

|মু|খ|ব|ন্ধ|

ইব্রাহীম মন্ডল আমার ছাত্র। তার রচিত *শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতা* গ্রন্থটি আমি আগ্রহভরে বিস্তারিত পাঠ করেছি। তিনি গ্রন্থটিতে এমন বিষয় বেছে নিয়েছেন যা যথার্থই যুগোপযোগী। কারণ, একবিংশ শতকে এদেশে যখন আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের উত্তরণ প্রক্রিয়া চলছে, তার সমান্তরালে আধুনিকতার নামে চলছে অপসংস্কৃতির চর্চা। সেই অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের মূল্যবোধে ফিরে যেতে হবে, যা কিনা সত্য-ন্যায় ও সুন্দরের মাঝে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্য-ন্যায় ও সুন্দরের অন্বেষায় আমাদের যুব সমাজকে পাঠ নিতে হবে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ঐতিহ্য থেকে। ইতোমধ্যে লেখক ইব্রাহীম মন্ডল বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করে বিদ্বজ্জন ও সাধারণ পাঠক সমাজে প্রশংসিত হয়েছেন। তিনি এই গ্রন্থে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। যথা–শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। উপর্যুক্ত বিষয়গুলির বিশদ আলোচনায় তিনি ব্যক্ত করেছেন মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রত্যয়। এছাড়া তিনি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন মানব সভ্যতা অর্জন ও উত্তরণের প্রক্রিয়ায় সমগ্র পৃথিবীর নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষের নানাবিধ চিন্তা, চেতনা, আচার ও বিশ্বাস। প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু করে একবিংশ শতকের প্রারম্ভে বিশ্বায়নের প্রবল চাপে এদেশের মানুষের শিল্প, সংস্কৃতি, যাপিত জীবন ও মূল্যবোধের যে আমূল পরিবর্তন ঘটছে তার ভয়াবহ রূপটি। লেখক গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন যা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উল্লেখিত 'রুচীর দুর্ভিক্ষ' এর সাথে তুলনা করা চলে।

গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে লেখক সন্নিবেশিত করেছেন 'শিল্পকলা'কে কেন্দ্র করে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় যথাক্রমে সংস্কৃতি সভ্যতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টিতে লেখকের মুন্সিয়ানা ধরা পড়ে "শিল্প" অর্থাৎ শিল্পকলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায়। লেখক মানব সভ্যতায় শিল্পকলার অভিযাত্রা থেকে শুরু করে পৃথিবীর নানা সভ্যতায় শিল্পকলার প্রয়োগ, ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং শিল্পকলা, সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সেখানে সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম কিভাবে শিল্পকলার ব্যবহার করেছে এবং করে চলেছে তাও ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া তিনি আলোচনা করেছেন ইসলামী শিল্পকলা কিভাবে তৌহিদের বাণীকে আত্মস্থ ও মহিমান্বিত

www.pathagar.com

করে শিল্পকলায় নানাবিধ সৌন্দর্য ও ঐক্যের সমন্বয় অর্থাৎ "unity in diversity'' সৃষ্টি করে আধ্যাত্মিকতার দিকে ধাবিত হয়েছে সে কথা নানা উদাহরণ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। যেমন– বিভিন্ন দেশের মসজিদ স্থাপত্যে স্থানীয় প্রভাব থাকলেও মসজিদ স্থাপত্যের ঐক্য এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য প্রকাশ পায় অলঙ্কৃত খিলান, গম্বুজ, মিনার, মিম্বার ও মিহরাব স্থাপনের মাধ্যমে। মসজিদ স্থাপত্যের উল্লেখিত স্থাপত্যিক উপাদানের দু-একটি উপস্থাপিত হলেও উপর্যুক্ত ধর্মীয় স্থাপত্যটি যে মুসলিম স্থাপত্য তা সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইসলামি শিল্পকলার অপর এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হলো ক্যালিগ্রাফি বা হস্তলিখন শিল্প। মধ্যযুগে মুসলমান শিল্পীরা এই শিল্পকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির সাহায্যে এর চরম পরাকাষ্ঠা সাধন করেন। ইসলামি ক্যালিগ্রাফি ইসলামের তৌহিদের বাণী এবং ঐক্যের কথাই যেন যুগে যুগে ঘোষণা করে চলছে।

লেখক ইব্রাহীম মন্ডল এই গ্রন্থে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়াস করেছেন। বর্তমানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সংকট প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে তা উদাহরণ দিয়ে তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মধ্যযুগে ইসলামি তথা মুসলিম সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা পাঠকের নিকট বস্তুনিষ্ঠ উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগে ইসলামি সভ্যতা অপরাপর তমসাচ্ছন্ন পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকবর্তিকার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

লেখক উপর্যুক্ত গ্রন্থে শিল্প, সংস্কৃতি-সভ্যতার বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এ প্রত্যয়টি আমাদের নতুন প্রজন্মকে হৃদয়ের মণিকোঠায় গেঁথে দিতে চেয়েছেন যে মহান সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের বিশ্বাসটি মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্পকলায় প্রতিভাত এবং তা পঠন-পাঠন এবং চর্চার মাধ্যমেই মানব সমাজের কল্যাণ নিহিত। উপর্যুক্ত গ্রন্থটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

আমি লেখক ইব্রাহীম মন্ডলের জ্ঞান সাধনার ও মানুষকে আলোকিত করার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই ও তার দীর্ঘায়ু এবং সুন্দর জীবন কামনা করি।

ড. নাজমা খান মজলিশ
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

ভূমিকা

মহান আল্লাহর সৃষ্টি সৌন্দর্য বা দুঃখ কষ্ট অনুধাবন করে হৃদয়-মনে যে আবেগ উদবেলিত হয় তার নান্দনিক প্রকাশই হল শিল্প।

শিল্প হলো সংস্কৃতির বাহন। সংস্কৃতির চরম উন্নতিই হলো সভ্যতা। সংস্কৃতি হলো উৎকৃষ্ট, পরিশীলিত উন্নত, মার্জিত, শালীন রুচিশীল হওয়া তাহজিব তমুদ্দিন। বিশ্বাসের প্রতিফলন। বইটিতে এই তিনটি বিষয় ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধর্মকে কেন্দ্র করেই মূলত শিল্পের উৎপত্তি। সব ধর্মই তার নিজস্ব রূপ, সৌন্দর্য নিজের মহিমা তার বিকাশ ঘটিয়েছে শিল্পের মাধ্যমেই, সব কিছুই একটা লক্ষ্য, গন্তব্য থাকে; উদ্দেশ্য থাকে, তাকে সামনে রেখেই পথ চলতে হয়।

বস্তুবাদী ছাড়া সব ধর্মই পরকালের বিশ্বাসী অর্থাৎ এই জীবন শেষ নয়, মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন শুরু, দুনিয়াতে যারা ভালো কাজ করবে তারা ভালো ফল এবং মন্দ কাজে মন্দাফল কঠিন আযাব ভোগ করবে। এই উপযুক্ত বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই ইসলামি শিল্প সংস্কৃতির উৎপত্তি।

নিছক আনন্দ আর ভালো লাগার জন্যে শিল্প নয়। ভালোও লাগবে, আনন্দ দিবে এবং পরকালে চিরস্থায়ী বা অনন্ত জীবনের আনন্দ পেতে উৎসাহিত করবে। পথ দেখাবে। এতে আদর্শ নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি হবে, যারা দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে। এটাই শিল্প সংস্কৃতির লক্ষ্য।

বসনিয়ার মরহুম প্রেসিডেন্ট বিখ্যাত পণ্ডিত আলিজা ইজ্জত বেগোভিজ তার শিল্প সভ্যতা বইয়ে লিখেছেন, "ধর্মহীন শিল্প মৃত সন্তানের সমতুল্য"। ডারউইন যখন তার বিতর্কিত মতবাদ নাস্তিক্যবাদ প্রচার করছিল। মাইকেল এঞ্জেলো কষ্ট করে সিসতিন চ্যাম্পেলে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কাহিনী চিত্রিত করে মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করছিলেন।

এই বস্তুবাদীরা শিল্পকে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়েছে। রাশিয়ার সোভিয়েত আন্দোলনের সময় অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতদের মাঝে শিল্প

www.pathagar.com

মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সু-ফল পেয়েছে। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ধর্মীয় বিষয় এবং বিশ্বাস নিয়ে যারা কাজ করেছিল সেইসব কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের তারা দেশ থেকে নির্বাসিত করেছে। অনেককে মেরেও ফেলা হয়েছে। আজ একবিংশ শতকে ডারউইনের মতবাদ বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীতে বস্তুবাদ যখন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে । মার্কস, লেনিন স্ট্যালিনের মূর্তি যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে তখন আবার ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ তবে এরাই আবির্ভূত হয়েছে।

এখন বাংলাদেশের কমিউনিস্টপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষদের ঘাড়ে সোয়ার হয়ে সুবিধা ভোগ করছে, তারা ইসলামি কালচারকে নির্মূল করে বস্তুবাদী বস্তুবাদী কালচার চালু করছে।

ডারউইনের মতে মানুষ অন্যান্য জন্তুর মতোই প্রাণী তবে একটু উন্নত জানোয়ার বা পশু, এটাই বস্তুবাদীদের বিশ্বাস এবং মৃত্যুই জীবনের সমাপ্তি, তারপর কিছু নেই। প্রাত্যহিক কাজে তার প্রতিফল ফুটে ওঠে। তবে তাদের কোনো কিছুতে বাধা নেই, যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। হয়তো কিছু কার্য লোকলজ্জার ভয়ে প্রকাশ্যে না করতে পারলেও দেখা যাবে গোপনে করে। তারমধ্যে পাশবিকতা, নির্লজ্জতা, পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কোনো কিছুই বাদ যায় না। এহেন কার্য নেই যা এরা করতে পারে না। পশুরা যেমন যৌনতার ক্ষেত্রেও আত্মীয়তার ধার ধারে না, এরাও তেমনি। কাজেই বস্তুবাদীরাদের কালচার না বলে পশু কালচার বলা যেতে পারে।

আজ দেশে এই বস্তুবাদীরা ভোগবাদী কালচার জন্ম দিচ্ছে। যার ফল বা পরিণতি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণের শত উৎসব পালন। অপহরণ, গুম, হত্যা, ধর্ষণ, নাশকতা, খুন ইত্যাদি। মূল্যবোধহীন সাংস্কৃতিক মানুষ, নেশা পশু প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে যেখানে সেখানে জৈবিক ক্ষুধা মিটাতে উৎসাহিত করে। লিভটুগেদার কালচার শুরু হয়েছে। বিয়েবহির্ভূত যৌনলীলা, এক সাথে থাকা। সম্প্রতি এক পত্রিকায় জরিপে দেখা গেছে, রাজধানী ঢাকা শহরেই কয়েক হাজার যুবকযুবতী লিভটুগেদার করছে। তাদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীও আছে। কী ভয়াবহ কথা। বাস্তবাদী কালচারে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ বাস্তবিক উঠে। গেছে অহরহ শিক্ষক লাঞ্ছিত হচ্ছে ছাত্রের হাতে, পুত্রের হাতে পিতা, মাতা, পিতার হাতে ছেলে খুনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এগুলোর ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিরই প্রভাব। ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, জাতিকে এরা কলংকিত করছে। আর ইসলামে পবিত্র কোরআনে মানুষকে বলা হয়েছে "আশরাফুল মাখলুকাত" মানে

www.pathagar.com

সৃষ্টির সেরা মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা, অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে কিভাবে চলবে, খাবে, পরবে অর্থাৎ জীবনযাপন করবে তার পদ্ধতিই "আল কোরআন" যা আল্লাহ, মুহাম্মদ (সা:) এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে পাঠিয়েছেন। যেহেতু মানুষ সৃষ্টির সেরা সেহেতু তার জীবনযাত্রা প্রণালীও পরিচ্ছন্ন পবিত্র ও সুন্দর, উন্নতর। সে যখন যা ইচ্ছে তা করতে পারে না। তার জীবন সু-শৃঙ্খল। এই উন্নত সৃষ্টির সেরা জীবের সু-শৃঙ্খল সুন্দর কোরআন এবং হাদিসের নির্দেশিত পদ্ধতিই ইসলামি সংস্কৃতি, যা মানুষকে সুস্থ সুন্দর কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়, মানুষ ইহ এবং পরকালীন কল্যাণ লাভ করে।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. নাজমা খান মজলিশ অত্যান্ত ব্যস্ততার মাঝেও পাণ্ডুলিপিটি পড়ে যত্ন সহকারে সংশোধন ও মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা যানাচ্ছি।

বইটি পড়ে যদি ভালো লাগে, ইসলামি কালচারের বিষয়ে যদি হৃদয়চেতনা বৃদ্ধি পায়, তবেই কিছুটা হলেও আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো। এই বই তৈরি করতে যে সব বই, লেখক ও প্রকাশকের সহায়তা নেয়া হয়েছে তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

- ইব্রাহীম মন্ডল
০৯/০২/২০১৫

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

"শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতা" মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। লেখক বইটিতে এমন বিষয়গুলো বেছে নিয়েছেন যা যথার্থই সময় উপযোগী। এ গুলোর সঠিক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমানে বিজাতীয় কৃষ্টিকালচার আমাদের ধর্মীয় চেতনা মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে নিজস্ব জাতিসত্তা যা হিরোশিমার অ্যাটমের চেয়েও ভয়াবহ।

বীরের জাতি আজ পরজীবীতে পরিণত হয়েছে।

ধর্মীয় চিন্তা বিশ্বাস থেকেই মূলত সংস্কৃতির উৎপত্তি। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান তাদের ধর্মীয় চিন্তা, চেতনা বিশ্বাসের মধ্যে যেমন পার্থক্য, তেমনি শিল্প, সংস্কৃতির মধ্যেও। লেখক ইব্রাহীম মন্ডল অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রচুর তথ্যসহ উপস্থাপন করেছেন। লেখক মানব সভ্যতায় শিল্পকলার অভিযাত্রা থেকে শুরু করে পৃথিবীর নানা সভ্যতায় শিল্পকলার ব্যবহার, ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং শিল্পকলা বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এছাড়া ইসলামি শিল্পকলা তৌহিদের বাণীকে আত্মস্থ ও মহিমান্বিত করে আধ্যাত্মিকতার দিকে ধাবিত হয়েছে- তা উদাহরণ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

ইব্রাহীম মন্ডল বইটিতে সভ্যতা ও সংস্কতির উহার বিশদ আলোচনা ও মূল পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে সংস্কৃতির যে সংকট দেখা দিচ্ছে তা উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মুসলিম সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পাঠকদের নিকট বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন।

লেখকের উপযুক্ত গ্রন্থ সংস্কৃতি সভ্যতার বিশদ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা নতুন প্রজন্মকে হৃদয়ে গেঁথে দিতে চেয়েছেন। শিল্প, মহান সৃষ্টিকর্তা, একাত্মবাদের বিশ্বাসটি মানব সভ্যতার সংস্কৃতির শিল্পকলা প্রতিভা এবং পাঠ করে চচার মাধ্যমেই মানবকল্যান নিহিত। ড. নাজমা খান মজলিশের মতো আমিও আশা করি বইটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমি লেখক ইব্রাহীম মন্ডলের প্রচেষ্টাকে মোবারকবাদ জানাই এবং তার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ **"শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতা"** বইখারা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারলে কিছুটা হলে সভ্যতা বিকাশ অবদান রাখার দায়িত্ব পালন করবে।

(এসএম রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

শিল্প	১৩	৫৭	সভ্যতা
সংস্কৃতি	২৫	৬১	ইসলামি সভ্যতা
দিন ও সংস্কৃতি	৩৩	৭০	ইসলামি শিল্পকলা
ইসলামি সংস্কৃতির সংজ্ঞা	৩৭	৭১	স্থাপত্য
ইসলামি সংস্কৃতির উৎস	৩৮	৭২	ফুল-লতা-পাতার ডিজাইন
পবিত্র সুন্নাহ	৩৮	৭২	জ্যামিতিক নকশা
বাঙালি সংস্কৃতি এবং ইসলামি		৭৩	ক্যালিগ্রাফি
তমদ্দুন ও সাহিত্য	৩৬	৭৪	দর্শন ও বিজ্ঞান
ইসলামি সংস্কৃতি ও মুসলিম তমদ্দুন	৩৯	৭৫	ভাষা-সাহিত্য
ইসলামি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য	৪৩	৭৬	আইন
বিজাতীয় সংস্কতি	৪৫	৭৭	শাসনব্যবস্থা
অশ্লীল সংস্কৃতি	৪৬	৮৭	অপসংস্কৃতির কুফল
সংস্কৃতিক আগ্রাসন	৪৬	৯১	আমাদের করণীয়
ইসলামি সংস্কৃতি	৪৭	৯৬	সহায়ক গ্রন্থাবলী
ভাষায় আগ্রাসন	৫৪	৯৭	চিত্রশিল্প

www.pathagar.com

শিল্প

শিল্প নিয়ে গবেষকদের গবেষণার অন্ত নেই। তাত্ত্বিকগণ বিভিন্নভাবে শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সহজভাবে বলা যায় শিল্প হলো- আনন্দ, অথবা দুঃখ-বেদনার কোনো কিছু দেখা বা অনুধাবন করে মনে যে আবেগ অনুভূতির সৃষ্টি হয় তার নান্দনিক প্রকাশ। মহান আল্লাহ মানুষের উপকারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আঠারো হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন বিনোদনের জন্যে সুন্দর নিসর্গ, পাহাড়, সাগর, ঝরনা, ফুল, ফল, নদী, অসংখ্য বৃক্ষরাজি। এই সৃষ্টি-সৌন্দর্য দেখে অথবা দুঃখজনক, বেদনার কিছু অনুধাবন করে হৃদয়-মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার প্রকাশই হলো 'শিল্প'। এ জন্য শিল্পীদের দেখা আর সাধারণ মানুষের দেখা এক নয়। সাধারণ মানুষ কোনো জিনিসের প্রতি যখন তাকান, সেটাকে বলা যেতে পারে শুধুমাত্র তাকানো। আর শিল্পীরা যখন তাকান তখন তা শুধুমাত্র তাকানোর নয়, তা অনুধাবন করে হৃদয়ঙ্গম করেন, হৃদয়ের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এবং শিল্পীদের থাকে আবেগপ্রবণ মন। যার মনে আবেগ যত বেশি, তার অনুধাবনক্ষমতা তত বেশি। আবেগহীন ব্যক্তি কোনো দিন শিল্পী হতে পারে না। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ পূর্ণিমার রাতে হঠাৎ ড্যাফোডিল ফুলের সৌন্দর্য দেখে, অনুধাবন করে আবেগপ্রবণ হয়ে তা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন, যা বিখ্যাত কবিতা 'ড্যাফোডিল'।

শিল্পীদের হৃদয়ঙ্গম ক্ষমতা, ধারণ-অনুধাবনক্ষমতা অনেক তীব্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, যোগসাধন করতে হলে শুনেছি করতে হয় চোখ বন্ধ করে, কিন্তু শিল্প সাধনা অন্যরকম চোখকে সর্বদা খোলা রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখির ন্যায় মুক্তি দিতে হয়। তারা আকাশের ভাসমান মেঘমালার ভাষা বোঝেন, উত্তাল সাগরের তরঙ্গমালা অথবা শান্ত নদীর ঢেউ, পুবালি, দক্ষিণা হাওয়া, ঝিরিঝিরি বাতাসে গাছে সবুজ পত্র-পল্লবের কম্পন এ সবের

www.pathagar.com

ভাষা বুঝেন, তাদের মনের যে অপ্রকাশিত আকাঙ্ক্ষা অথবা হৃদয়ের গভীরের ক্রন্দন প্রকাশ করাই 'শিল্প'।

প্রকাশের মাধ্যমের ভিন্নতার জন্যে শিল্পের ভিন্নতা হয়। যেমন রং রেখা, ফর্মের মাধ্যমে প্রকাশই চিত্রশিল্প। শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ কাব্য বা কবিতা, সুরের মাধ্যমে প্রকাশ গান, বা সুরশিল্প, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ নৃত্যশিল্প, (বডিলেঙ্গুয়েজ)- ইমিটেশনের মাধ্যমে প্রকাশ নাট্যশিল্প এবং তার উদ্দেশ্য অভিন্ন। তবে শুধুমাত্র প্রকাশের ভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

শিল্প কী? এর উত্তর বিভিন্ন মনীষী ও আর্ট-ক্রিটিকগণ নানাভাবে দিয়েছেন। শিল্প সমালোচক দার্শনিকরা বিভিন্ন মতও প্রকাশ করেছেন। কারো কারো মতে শিল্প হচ্ছে অপ্রকাশিত রহস্যময় জীবনের প্রকাশ। বিখ্যাত মনীষী টলস্টয় বলেন, শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত অনুভূতি, রং, রেখা, বা শব্দের সাহায্যে অন্যের মনে সঞ্চারিত করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। তার মতে শিল্পের উদ্দেশ্য শুধু অনুভূতির সঞ্চার।

শিল্পের উদ্ভব হয়েছে মানুষের সহজাত সৃজনশীল স্বভাব থেকেই। এর অন্যতম আমাদের জীবনে পূর্ণতা ও বিস্তৃতি যোগ করা। শিল্পকে বলা যেতে পারে আনন্দময় কোনো আকার বা রূপ সৃষ্টির চেষ্টা। কিন্তু শিল্পের উদ্দেশ্য সব সময় শুধুমাত্র আনন্দ দেয়া নয়। পৃথিবীর সব কিছুই শিল্পের উপকরণ হতে পারে, ধ্বনি, রং, মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু সব। মানুষ এই উপকরণ নিয়ে নিজের চাহিদা বা ইচ্ছামতো এমন একটি রূপ তৈরি করে যা তার বোধকে তৃপ্ত করে। এ জন্য সরলভাবে শিল্পকে বলতে পারি শিল্পীর কোনো অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গী যা আমাদের মনেও গভীরভাবে সংক্রমিত হয় বা আমরাও কোনোভাবে সেই অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসি। অথবা বলা যায় শিল্প মানুষের কল্পনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার রূপ দান করার এক বিশেষ চেষ্টা। মানুষের সুকুমার বৃত্তির প্রতিফলন।

শিল্প নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে যথার্থ শিল্পের স্বরূপ উদঘাটনের লক্ষ্যে। ভালো শিল্প, মন্দ শিল্প, সার্থক শিল্প, অসার্থক শিল্পের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে শিল্পী এবং দর্শকসমাজকে তারা প্রতিনিয়তই সচেতন করে চলেছেন। শিল্পের ফর্ম (Form), সৌন্দর্য (Beauty), অনুকরণ (Imitation),

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিত (Perspective), অনুপাত (Proportion), ঐকতান (Harmony), ভারসাম্য (Balance), ঐক্য (Unity) প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত এবং সার্থক শিল্পের ব্যাখ্যাদানে এগিয়ে এসেছেন- প্লেটো, এরিস্টোটল, ক্রোচে, হেগেল, রঁমা রলা, অস্কার ওয়াইল্ড, অবনীন্দ্রনাথসহ বিশ্বখ্যাত অগণিত দার্শনিক এবং শিল্পতাত্ত্বিকগণ।

দার্শনিক প্লেটোর মতে, আর্ট হচ্ছে অনুভূতির প্রকাশ, অনুকরণ নয়। যে অনুকরণে শিল্পীমনের স্পর্শ নেই তা যান্ত্রিক ব্যাপার মাত্র। অনুসৃত শিল্পকে মানুষ যখন নিজের মনের মতো করে মূর্ত করে তখনি সেটা আর্ট বা চিত্রকলা হয়ে ওঠে। সক্রেটিস বলেছেন– 'আর্ট সত্য এবং বাস্তব থেকে আলাদা।' সেন্ট অগাস্টিন বলেছেন– 'আর্ট হচ্ছে আবিষ্কার বা অনুকরণ নয়।' কান্ট বলেছেন- 'শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সর্ববাধাহীন এবং যে কোনো বিশেষ জাগতিক উদ্দেশ্য বিরহিত।' সুতরাং শিল্পতাত্ত্বিক অস্কারওয়াইল্ড এবং অন্য তাত্ত্বিকদের অভিমত অনুযায়ী সুস্পষ্ট যে, প্রকৃত শিল্পী কখনোই বাস্তবে দেখা বিষয়বস্তুর স্বরূপ বা হুবহু আঙ্গিকে ক্যানভাসে তুলে ধরেন না। যারা এ বিষয়ে ততটা সচেতন নন কিংবা আদৌ সচেতন নন তারা ততটা সার্থক কিংবা একেবারেই সার্থক শিল্পী নন। যারা এ বিষয়টি সম্পর্কে যত বেশি সচেতন, যারা এই নিয়মনীতি মেনে যত বেশি সার্থকরূপে শিল্প নির্মাণ করেন তারা তত বড় শিল্পী, তত বেশি সার্থক শিল্পী এবং তাদের সৃষ্ট শিল্প তত বেশি সার্থক এবং যথার্থ শিল্প। প্রকৃত শিল্প।

অতএব আমরা বলতে পারি যে দৃশ্য-অদৃশ্যকে শিল্পীর চিত্তরসে রসায়িত করে বা স্থিতিশীল রূপ ও মহিমা দান করে তখনি সেটা শিল্পকর্ম হয় এবং যিনি এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তাকেই শিল্পী বলে।

শিল্প সম্পর্কে শিল্পতাত্ত্বিক সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'শিল্প হচ্ছে সময়, স্থান এবং অন্তরবোধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার একটি প্রতীক। শিল্পী যে দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখছেন, অবিকল সে দৃষ্টি আমার না থাকতে পারে কিন্তু আমি যদি অনুভব না করতে পারি শিল্পী কি দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখছেন, তাহলে শিল্পীর সৃষ্টিকে আমি প্রশংসা করতে পারবো না। এটা সম্ভবপর নয়। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার দৃষ্টির বৈভব। আমাদের চোখ

www.pathagar.com

আছে, আমরা চেয়ে দেখি, কিন্তু জন্মসূত্রেই আমরা দৃষ্টিকে পাই না। যেমন জন্মসূত্রেই আমরা ভাষাকে পাই না। একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে ভাষার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তেমনি সে দৃষ্টির অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ তার ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা থাকে এবং দেখবার ক্ষমতা থাকে। কথা বলার ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে সে যখন বড় হয়, বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে আসে, মানুষের উচ্চারণ শোনে, সেগুলো অনুকরণ করে। ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তি যখন তার সজীব হয় তখন সে যথার্থ যুক্তিসঙ্গতভাবে কথা বলতে শেখে। তেমনি দৃষ্টির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। প্রথমে শিশু যা দেখে সে দেখার অর্থ হচ্ছে-বস্তুকে চিহ্নিতকরণ। এটা ক্রমশ প্রবল আকার ধারণ করে। শিশু প্রথমে তার মাকে চিনতে শেখে, যে একান্তভাবে তার ঘনিষ্ঠ, সে পিতাকে চিনতে শেখে এবং অবশেষে ক্রমান্বয়ে মাতার সঙ্গে অন্য মহিলার পার্থক্যও সে নির্ণয় করতে শেখে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে যে মাকে চিনে ফেলেছে তা নয় কিন্তু ক্রমান্বয়ে ঐ দৃষ্টির অধিকারটা সে লাভ করতে থাকে। এভাবে দৃষ্টির অধিকার লাভ করে সে মানুষ দেখতে শেখে। অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায়ে একজন যখন শিল্পী হবে, তখন শিল্পীকে মনে রাখতে হবে যে, শুধু দৃষ্টির অধিকার নিয়েই নয়, দেখার ক্ষমতা নিয়েই নয়, দেখার বস্তুকে নির্ণয় করা এবং অবশেষে যথার্থ দৃষ্টি দিয়ে দেখা, এটাই হলো শিল্পীর প্রধান কর্ম।

শিল্প হচ্ছে দৃষ্টিগোচরতায় পৃথিবীকে অনুভব করার একটি আবেগময় কৌশল। এছাড়া আরও নানাবিধভাবে পৃথিবীকে অনুভব করা যায়। যেমন ভূতত্ত্বের সংজ্ঞায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে, গাণিতিক বিবেচনায়, আপেক্ষিকতায়, কল্প-কাহিনী তৈরি করে অথবা দার্শনিক বিভাবনে বা চিন্তায়। কিন্তু শিল্প হচ্ছে ভিন্নতর একটি চৈতন্যভিত্তিক সিদ্ধি, দৃষ্টির সহায়তায় যাকে আমরা ব্যাখ্যা করি এবং দৃষ্টিগত তাৎপর্য যাকে আমরা মূর্তিমান করি। শিল্পী বিশেষ কৌশলে তাঁর দৃষ্টিনির্ভর অনুভূত সত্যকে রং ও রেখার সাহায্যে চিত্ররূপ দান করেন অথবা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মূর্তিময়তায় পর্যবসিত করেন। মানুষ যে কত চিত্ররূপে পৃথিবীতে দেখেছে তার প্রমাণ পাই শিল্পসত্তার বিকাশের ইতিহাসে। দৃষ্টিগত অনুভূতির যে কত বিচিত্র স্বরগ্রাম আছে, আছে বিচিত্র প্রয়াস, পৃথিবীর শিল্পসামগ্রী লক্ষ্য করলে তা প্রমাণিত হয়। বস্তুসত্তায় উপকরণ বা বাস্তবতা

www.pathagar.com

শিল্পীর লক্ষ্য নয়, শিল্পীর লক্ষ্য হচ্ছে বিশেষ অনুভূতি, যা প্রতিস্পন্দিত হয় তার শিল্পকর্মে।

হারবার্ট রিড শিল্পবোধের ক্ষেত্রে দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন। সে দুটো শব্দ হচ্ছে 'পার্সেপশন (Perception) এবং 'এক্সপ্রেশন' (Expression)। দৃষ্টির ক্ষেত্রে এ দুটি শব্দের একান্ত প্রয়োজন। আমরা 'পারসিভ' করি একটি বস্তুকে, অর্থাৎ একটি বস্তুকে অনুভব করি। দেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে অনুভব করতে না শিখি তাহলে আমি কিছুই দেখলাম না। সুতরাং আমি বস্তুকে দেখবো, বস্তুকে নির্ণয় করবো, বহু পাখি উড়ে যাচ্ছে দেখেন, বহু নদী দেখেন ও বাঁক দেখেন, নদীর স্রোতের উদ্যমতা দেখেন। কিন্তু সব কিছুকে তিনি প্রকাশ করেন না। হঠাৎ এর মধ্য থেকে তাকে নির্বাচন করতে হয়। এই যে চৈতন্য এই চৈতন্যকে 'হারবার্ট রিড' বলেছেন- 'পার্সেপশন'। পার্সেপশন যে পর্যন্ত না আসছে একজন শিল্পীর মধ্যে সে পর্যন্ত কিন্তু 'এক্সপ্রেশন' যাকে বলা হচ্ছে, সে প্রকাশ করার ক্ষমতা তিনি পাচ্ছেন না। শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক রূপে ছবি আঁকা শিখলেই একজন যথার্থ শিল্পী হয়ে ওঠে না। যাকে আমি দৃষ্টির বৈভব বলছি, সেই দৃষ্টি বৈভব তাকে অর্জন করতে হয়। যথার্থ দৃষ্টির বৈভব অর্জন করলে পরে একজন শিল্পী যথার্থ রূপে শিল্পী হতে পারবেন। মানুষ যখন দেখে, তখন কিভাবে দেখে। এই দেখা নিয়ে বহু শিল্পী বহু সমালোচক বহু কথা বলেছেন। একটা দৃষ্টি আছে, তাকে বলা হয় 'অপটিক্যাল' দৃষ্টি। অর্থাৎ চোখের যে ক্ষমতাটুকু, সে ক্ষমতা নিয়ে যে বোধ, সেই অপটিক্যাল দৃষ্টি আমাদের সকলেরই আছে। আমি দেখছি, আপনি দেখছেন, দূরের একজন মানুষ দেখছে, সকলেই দেখছে। সেই অপটিক্যাল দৃষ্টি কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টি নয়। শিল্পীর দৃষ্টি ভিন্নতর।

লিওনার্দো তার সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সব দিকেই এক অসীম সম্ভাবনাময় জগত; তাঁর দৃষ্টিতে বিরাজমান ছিল সর্বত্রই এক অপূর্ব সুন্দর, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ভুবন। নজরুলের এই কথাগুলোর সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে : 'এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।' মাঝে মাঝে চিন্তার জগতে মগ্ন থাকার তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ তাই আপনমনে বসে আছে কুসুম বনেতে।' লিওনার্দোর চিন্তায় কিভাবে বিজ্ঞান ও অযৌক্তিকতা সহাবস্থান করে এবং পরস্পরকে অনুপ্রানিত ও শক্তিশালী করে। তাই এখানে

www.pathagar.com

অযৌক্তিকতার উল্লেখ কিঞ্চিৎ আশ্চর্যজনক, হয়ত এই ধরনের অযৌক্তিকতার কিছু যুক্তি রয়েছে। লিওনার্দোর অবস্থানের মৌলিকত্ব, যেটাতে চিত্রাঙ্কন একটি সমগ্র অথবা সর্বগুণান্বিত শিল্পকলার স্বরূপ কল্পনা করা যায় সেটার পরিণাম হয় এক ধরনের বস্তুনিষ্ঠতা, যা সাধিত হয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে। এটা একটি শিল্পকর্মকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় যেখানে সেটা নির্বোধ ধাঁধাঁ বা বোঝাসমূহ থেকে মুক্ত। এই অভিরাম অভ্যন্তরীণ বিতর্কের মাধ্যমে ..., শিল্পী ক্রমশ তাঁর সংবেদনশীলতা ও অনুভব শক্তিকে উঁচুস্তরে নিয়ে যেতে পারে; কোনো আবেগ প্রবলভাবে প্রকাশ করার জন্য নয়, যা সাধারণত স্থূলরুচি সম্পন্ন হয়, বরঞ্চ মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রাণবন্তভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে।'

লিওনার্দো প্রবল আবেগ প্রকাশ করতে পছন্দ করতেন না; অন্য শিল্পীদের মতো, যাদের কর্মে রয়েছে সংযম, পুসাঁ থেকে মাতিস পর্যন্ত। এই ধরনের প্রবল আবেগকে একটি 'ভাবঘনিষ্ঠ সাধারণত্ব'র পরিণাম বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন যে এই 'অভ্যন্তরীণ বিতর্ক'কে অভূতপূর্ব সুযোগ দেয়া উচিত। অর্থাৎ বিতর্ক ও চিন্তা অত পরিমাণ হওয়া উচিত না যে ছবি আঁকা সেটা থেকে বাধাগ্রস্ত হয়। এখানে উল্লেখ যে, লিওনার্দো বেশ কয়েকটি ছবি অসমাপ্ত রেখে যান।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মহান ও প্রভাবশালী স্বাধীন শিল্পী হলেন পিকাসো, যিনি (জর্জ ব্রাকের সাথে) 'কিউবিজম্' সৃষ্টি করেন। তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধ (SPANISH CIVIL WAR) দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং ১৯৩৭ সালে তার বিখ্যাত ছবি গুয়ের্নিকা (GUERNICA) আঁকেন যেটাকে মহান ও পীড়াদায়ক রচনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে অবশেষে ফ্যাসিবাদিরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন একটি প্রদর্শনীতে, যেটাতে পিকাসো উপস্থিত ছিলেন, গুয়ের্নিকা ছবিটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছবিতে স্পেনের গৃহযুদ্ধের নিষ্ঠুরতা প্রতিফলিত হয়েছে। পিকাসো ছবিটির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন যখন একজন সামরিক কর্মকর্তা দেখে পিকাসোকে জিজ্ঞেস করলেন: 'ছবিটি আপনি করেছেন?' জবাবে পিকাসো যা বলেছিলেন সেটা চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে; 'না, আপনি করেছেন।' ছবিটি New York' এর MUSEUM OF MODERN ART এ সংরক্ষিত রয়েছে। এই ঘটনাটি থেকে

www.pathagar.com

শিল্পীদের যে অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেটা প্রতীয়মান হয়।

শিল্প নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সেই যে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০০ সাল থেকে ম্যাগডেলিয়ন মানুষদের অঙ্কিত গুহা গাত্রের চিত্র থেকে বিতর্কের শুরু হয়েছে আজও তার শেষ হয়নি। বিতর্কের মধ্য দিয়ে শিল্পের যত মত, পথ ও ধারার আবির্ভাব ঘটেছে বিতর্ক যেন ততই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। আর এমনিভাবেই বিভিন্ন দার্শনিক ও শিল্পতত্ত্ববিদদের বিভিন্ন মতবাদে পূর্ণ হয়ে গ্রন্থের পর গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করছে। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পরীতিতে শিল্প শাস্ত্রকার পণ্ডিত যশোধর আবিষ্কৃত 'ষড়ঙ্গ'-এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে এই ষড়ঙ্গকে ভারতীয় শিল্পের প্রাণ হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বেঙ্গল স্কুলের প্রধান পুরুষ, তিনি এই ষড়ঙ্গকে অগ্রাহী করলেন। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ, ষড়ঙ্গ-এর এই ছয়টি বিষয়কে অবলম্বন করে শিল্পচর্চার যে প্রচলন ছিল তিনি তার বিরোধিতা করেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পের জন্যে যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, সেই স্বাধীনতার কথা পৃথিবীর সকল শিল্পবোদ্ধা পণ্ডিত এবং তাত্ত্বিকেরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রায় সকলেই শিল্পীর স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বলেছেন, শিল্পী কোনো বাধাধরা শাস্ত্রবিধি মানবেন না, কোনো কিছু দেখে অনুকরণ করবেন না, শিল্পী তার নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন করে তাতে মনের মাধুরী মিশিয়ে নান্দনিক রসসিক্ত শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে চমৎকৃত করবেন। নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর শিল্পভাণ্ডারকে করবেন পরিপূর্ণ। এই সৃষ্টিধর্মী শিল্প সম্পর্কে তাই Plato বলেছেন- 'The real artist does not imitate, he creates something now.' Socretes বলেছেন Art is removed from the actuality something new.' Sent. Augustine বলেছেন Art is invention not imitation. সুতরাং উল্লেখিত তথ্যসমূহে সুস্পষ্ট যে, প্রকৃত শিল্প হবে শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টি। দৃশ্যমান জগতের চেনা-জানা কোনো বিষয়ের হুবহু অনুকরণ নয়।

www.pathagar.com

অধরার ও অদেখার পিছনে ছুটে চলেছেন শিল্পী। তাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, শিল্প হচ্ছে অতৃপ্ততা, একটা তৃষ্ণা অর্থাৎ খুঁজে বেড়ানো। শিল্পীর অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হয় উৎসারিত হয় কল্পনায়। তবু সুন্দর ধরা দেয় না। আকাঙ্ক্ষিত পরম সুন্দরকে কখনই শিল্পী পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। তাই শিল্পীর শিল্পও কখনো পূর্ণতা পায় না।

তিনি বলেছেন, বর্তমান প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সমস্যা সত্ত্বেও কোনো শিল্পীরই নিজ দেশের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলেছেন, যেমনটি হননি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ। তার মতে কামরুল হাসানের তিন কন্যা ছবিতে কিউবিজমের ভাঙচুর থাকলেও রঙ এবং মেয়েদের শরীরী আদল একেবারেই বাঙালি।

বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী অরি-মাতিসের একটি শিল্পকর্ম আছে তার নাম রাজহাঁস। ছবিটিতে রাজহাঁস বলতে দুটো দুই এর মতো লাইন। বাস্তবে কোনো দর্শক যদি রাজহাঁস খোঁজেন তবে কিন্তু পাবেন না। তবে কি আমরা বলবো শিল্পী মাতিস রাজহাঁস আঁকতে জানেন না বলে শুধু দুটো রেখা এঁকেছেন? না এখানে রাজহাঁসের রাজকীয় ভাবটাই শুধু দুটো রেখায় একেঁছেন। এবং তা আঁকতে শিল্পী মাতিসের একাধারে তিন দিন সময় লেগেছে। প্রথমে রাজহাঁস সামনে রেখে তিনি ড্রইং করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্কেচ করেছেন, অনুশীলন করেছেন। অনুশীলন করে করে শেষ এসে দাঁড়ালো দুটো লাইন, যে লাইন দুটোতে রাজহাঁসের রাজকীয় ভাবটাই ফুটে উঠেছে। আর সেটি বিশ্ব বিখ্যাত শিল্প কর্ম হিসেবে স্বীকৃত। আর আমরা আগেই বলেছি, ছবি নকল নয়, বাস্তবে অনুকরণ নয়, ছবি হলো বাস্তব দেখে মনের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ।

ড. আব্দুস-এর ভাষায় শিল্প হলো অ-প্রকাশিত রহস্যময়তার প্রকাশ। আর এটাই হলো আবিষ্কার বা সৃষ্টি আর যেকোন সৃষ্টি মানেই আনন্দ।

শিল্পী দা-ভিঞ্চি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, কবিতা এবং সঙ্গীতের চেয়ে চিত্রকলা অনেক বেশি উচ্চমান সম্পন্ন। তিনি বলেন, সঙ্গীতের চেয়ে

www.pathagar.com

চিত্রকলা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। তার মতে, একজন কবির চেয়ে একজন চিত্রশিল্পী প্রকৃতির যাবতীয় বিষয়বস্তুর ফর্মকে যথাযথভাবে চিত্রে তুলে ধরতে সক্ষম এবং এ কারণেই একজন চিত্রশিল্পীর সম্মান সবার চেয়ে উচ্চে। দা-ভিঞ্চি যে শুধু চিত্রকলা বিষয়েই দক্ষ ছিলেন তা নয়, তিনি অন্যান্য বিষয়েও ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

চিত্রকলা বিভিন্ন বিষয়কে যথাযথভাবে সূত্রবদ্ধ কিংবা প্রকাশ করতে সক্ষম, বিভিন্ন বিষয়ের গতি-প্রকৃতি, জীবজন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও তার দ্রুত গতি প্রকাশ করে, চিত্রকলা গাণিতিক। কারণ চিত্রকলার আলোছায়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির সঠিক মাপজোক এবং অনুপাত সঠিকভাবে নির্ধারণ করে। লিওনার্দো দা-ভিঞ্চির রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপিই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠার পুঁথিতে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করে গেছেন। যার এক স্থানে লিখেছেন যে, সূর্য স্থির। তার গতি নেই। অর্থাৎ কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওর বহু পূর্বেই তিনি এটা অনুমান করেছিলেন।

চিত্রকলা হচ্ছে গবেষণামূলক বিজ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্নধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর নির্ভরশীল। লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি এ সকল বিষয়ে শুধু অভিমতই ব্যক্ত করেননি, তিনি নিজে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। মানুষের দেহের গঠন, অনুপাত ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক মাপজোকের প্রয়োজনে প্রায় ত্রিশটি মৃতদেহ নিজ হাতে কেটে-চিরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

শিল্প সম্পর্কে মতামতের অন্ত নেই। শিল্পী, সমালোচক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিকদের মতে শিল্প হচ্ছে : অপ্রকাশিত রহস্যময় জীবনের প্রকাশ। জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা সমালোচনা, বস্তুর বাহ্যিক আনন্দ, একমাত্র বৈধ সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন ধর্ম, নিছক খেলা, আদর্শবাদের বাহ্যিক রূপ বাধ্যবাধকতামুক্ত, অবাস্তবের আবিষ্কার (বাস্তব সুন্দর নয় এই অর্থে), নিজ অভিব্যক্তি, মানবতার প্রকাশ ইত্যাদি। শিল্পে মানবতা এবং শিল্পীমনের একান্ত অনুভূতির প্রকাশ শিল্পে-সাহিত্যে আমরা নানাভাবে মূর্ত হতে দেখেছি। এক্সপ্রেশনিজম বা প্রকাশবাদ হচ্ছে সকল শিল্পের মধ্যে হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের একটি মৌলিক বিষয়। লুৎরেক, গগিন, ভ্যানগগ এরা ইমপ্রেশনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ তাদের

www.pathagar.com

হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটিয়েছেন। প্রকৃতিকে ইচ্ছে মতো গড়েছেন। এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা এবং শিল্পকর্মে তা অন্তঃপ্রবিষ্ট করা। শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে মানবিক ধ্যান-ধারণা ও তার রীতি-পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে বহু পূর্ব থেকেই। মানবতাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিল্পী সচেতনভাবে তার হৃদয়ের মানবিক চেতনার বিভিন্ন দিকগুলো কাজে প্রক্ষিপ্ত করে থাকেন।

গ্রিক দার্শনিক এবং গণিতবেত্তা পিথাগোরাসের মতবাদ অনুযায়ী সঙ্গীত মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং মানসিক প্রশান্তি আনয়ন করে। চরিত্র সংশোধনেও মানবহৃদয়ে সুন্দর প্রভাব ফেলতে সাহায্য করে। পিথাগোরাসের পর দার্শনিক প্লেটো এই তত্ত্বের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন, যা পরবর্তী পর্যায়ে ঈষৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে দার্শনিক অ্যারিস্টটল গ্রহণ করেন। এরও পরে দার্শনিক স্টইক এ তত্ত্বের অনুসারী হন। তিনি অবশ্য কবিতার প্রতিও আগ্রহী ছিলেন এবং সৌন্দর্য বিষয়ক তত্ত্বের প্রতিও ছিলেন সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। সর্বোচ্চ সত্যের বাহন হিসেবে, অপ্রস্তুত প্রশংসার দ্বারা মানবজীবনকে অলংকৃত করার বাসনায় তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কবিতা শিক্ষাদানের প্রতি জোর দিয়েছিলেন অথচ দার্শনিক এপিকিউরাস সঙ্গীতকে প্রশ্রয় দেননি, তিনি ছিলেন সঙ্গীতবিরোধী। তাঁর মতে, সঙ্গীত থেকে কিছু গ্রহণ করার নেই। সঙ্গীত যে সুখানুভূতি এবং প্রশান্তিদানে সক্ষম তিনি তা বিশ্বাস করতেন না।

ডোনাটেলো, মাইকেল এঞ্জলো এবং ভ্যানগগ- এরাঁ সকলেই মানবতাবাদী শিল্পী। ভ্যানগগ বলতেন- 'আমি আঁকতে চাই মানবতা, মানবতা আবার মানবতা।' ১৯৪২-৪৩-এ সমগ্র বাংলাজুড়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তা ছিল মানুষেরই সৃষ্ট। এই দুর্ভিক্ষের কারণে মানবতার যে চরম অবমাননা জয়নুল লক্ষ্য করেছিলেন তার প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ তুলি ও কালির মাধ্যমে। আমাদের সমাজের দুঃখ এবং ক্ষত চিহ্ন অবলোকন করে জয়নুল সে সমস্ত দুঃখ-বেদনা এবং প্রবঞ্চনার দহন থেকে মানবসত্তাকে মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধকে বাঁচাতে সদা তৎপর ছিলেন। তাঁর আজীবন প্রচেষ্টাই ছিল দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি এ দেশের মানুষকে, দেশকে ভালোবাসতে

www.pathagar.com

শিখিয়েছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে দেশের ছোট-বড় সকলে দেশকে, দেশের মানুষকে আপন করে নেয়ার গোপন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

শিল্পশাস্ত্রে অনুকরণ বা ইমিটেশন বলে একটি কথা আছে। ইংরেজি ইমিটেশনের আভিধানিক অর্থ হলো অনুকৃতি, অনুক্রিয়া, অনুবর্তন, অনুকরণ, নকল, মেকি, কৃত্রিম প্রভৃতি। অর্থাৎ কোনো মূল বিষয়বস্তু নয়। মূল বিষয়বস্তুর অনুরূপ কিংবা হুবহু রূপ। যেমন অলঙ্কার পাওয়া যায় যার বাহ্যরূপ হুবহু স্বর্ণের মতো অথচ স্বর্ণের নয়। হুবহু রূপোর মতো অথচ রূপোর নয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও একই কথা। কোনো কোনো চিত্র দেখতে হুবহু পিকাসোর চিত্রের অনুরূপ কিন্তু পিকাসোর নয়। হুবহু কামরুল হাসানের চিত্রের মতো অথচ কামরুল হাসানের নয়। অর্থাৎ এগুলো সবই নকল। নকল বা ইমিটেশন অলঙ্কারের যেমন কোনো মূল্য নেই, মূল্য নেই তেমনি নকল শিল্পকলার। এ সকল শিল্প বিষয়ের মূল্য যে একেবারে নেই, তা অবশ্য নয়। মূল্য আছে। তবে তা সোনার কিংবা রূপোর মূল্যের সমান নয়। কিংবা মূল চিত্রের সমান নয়। এ মূল্য নগণ্য। এ মূল্যের পার্থক্য মূল চিত্র এবং চিত্রের ছাপানো পোস্টারের মধ্যে সেই পার্থক্য। সুতরাং ইমিটেশনের মূল্য যে অতি নগণ্য সেটা স্পষ্ট।

জনৈক লেখক কিংবা সমালোচক, সব বিষয়ে একজন শিল্পীর সমানধর্মী হতে হয়। অর্থাৎ শিল্পনৈপুণ্য ও শিল্পকুশলতা এবং শিল্পবিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে একজন শিল্পীকে তত্ত্বীয় বিষয়ে যেমন অভিজ্ঞ হতে হয়, তেমনি অভিজ্ঞ হতে হয় একজন লেখক কিংবা সমালোচককেও। অন্যথায় বিভ্রান্তি অনিবার্য। একজন লেখক সহজেই পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারেন তার ভুল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে। বিভ্রান্ত যে শুধু পাঠকদেরই করেন তাই নয়, সাথে সাথে লেখক নিজের অজ্ঞতাকেও প্রকাশ করেন। একই সাথে সার্থক শিল্পী, শিল্প এবং শিল্পরসিক দর্শকদের মাঝে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেন, যা শিল্পীর জন্যে, শিল্পের জন্যে এবং দেশের জন্যে ক্ষতিকর। লেখক ভুলে যান যে, বাস্তব ঘটনাপ্রবাহকে চিত্রে স্থান দেয়া শিল্পীর কাজ নয়। শিল্পীর কাজ তথা দায়িত্ব প্রকৃত বিষয়ের সারবস্তুর গূঢ়সত্তা আবিষ্কার করা এবং তার বিশেষ গুণগুলো ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে নিজস্ব অর্থপূর্ণ ফর্ম বা সিগনিফিকেন্ট ফর্ম সৃষ্টি করা। বাস্তবে ঘটে যাওয়া বিষয়ের অনুকরণে রচিত শিল্পকর্ম আর সেই ঘটনার ফটোগ্রাফিতে তেমন কোনো

www.pathagar.com

পার্থক্য থাকে না। এই সহজ কথাটি শিল্পী যেমন ভুলে যান, তেমনি ভুলে যান লেখকও। ফলে শিল্প এবং সমালোচনা উভয়ই নিম্নমানসম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের প্রবক্তা শিল্পী জয়নুল আবেদিন বলেছেন, আমি ছবি আঁকি মহৎ শিল্পী হওয়ার জন্যে নয়, জীবনকে সুন্দর করার জন্য, জীবনকে সুন্দর করতে যে শক্তি বিরোধিতা করে তাকে চিহ্নিত করার জন্য। যে শিল্প জীবনকে সুন্দর করতে দিক-নির্দেশনা দেয় সেটাই মহৎ শিল্প। যে শিল্পী তা সৃষ্টি করেন তিনিই মহৎ শিল্পী।

বস্তুত শিল্পের জন্য এ ধারণার পরিবর্তে শিল্প-জীবনের জন্য এ তথ্য এখন সাধারণভাবেই গৃহীত। শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মনে করি শিল্প সত্যের জন্য, শিল্প সুন্দরের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য।

শিল্পীরা রূপবিলাসী রূপকার এবং রূপটাই আর্ট। মানুষ স্বভাবগতভাবেই সৃজনশীল।

www.pathagar.com

সংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' বাংলা শব্দ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture. ইংরেজি Culture শব্দের অর্থই সংস্কৃতি। Culture শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Culture থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো কৃষিকার্য বা চাষাবাদ। তার মানে জমিতে উপযুক্তভাবে বীজ বপন ও পানি সিঞ্চন করা। বীজের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও বিকাশের ব্যবস্থা করা। সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ, উত্তম স্বভাব-চরিত্র। Culture এর বিপরীত শব্দ হলো অসভ্য-বর্বরতা। আর Culture হলো রুচিশীল, শালিন, মার্জিত, সুরুচিসম্পন্ন ভদ্র আচরণবিধি সম্পন্ন মানুষকে Cultured man বলে। আবার Culture বা সংস্কৃতি বলতে একদিকে মানুষের জাগতিক, বৈষয়িক ও তমুদ্দুন এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়।

একটা লোক যদি বিবস্ত্র অবস্থায় রাস্তা দিয়ে যেতে থাকে তাকে কি আমরা কালচারাল বলবো? না Uncultured man বলবো?

সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কার থেকে এসেছে, যেমন : সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ, যে কোনো দোষ-ত্রুটি, ময়লা-আবর্জনা দূর করে ঠিক করা।

ইংরেজি Culture শব্দের বাংলা অর্থ করা হয়েছে সংস্কৃতি যা সংস্কৃত ভাষার শব্দ–যার অর্থ উন্নতমানের চরিত্র।

অধ্যাপক Murray তাঁর ইংরেজি ডিকশনারিতে লিখেছেন : Culture হচ্ছে সভ্যতা, এরই মানসিক ও রুচিগত ব্যাপার। তাতে থাকা-খাওয়া, নিয়ম-নীতি, সামাজিক-সামষ্টিক, আচার-অনুষ্ঠান, স্বভাব-চরিত্র এবং আনন্দ-স্ফূর্তি লাভের উপকরণ। আনন্দ উৎসব, ললিতকলা, শিল্পচর্চা, সামষ্টিক আদত-অভ্যাস, পারস্পরিক আলাপ-ব্যবহার ও আচরণ বিধি শামিল রয়েছে এতে।

প্রখ্যাত দার্শনিক কবি T. S. Eliot তার লেখায় Culture বা সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন : সংস্কৃতির দুটি বড় চিহ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ-একটি ভাবগত ঐক্য আর দ্বিতীয়টি তার প্রকাশ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কোনো রূপ বা দিক। তার মতে, সংস্কৃতি ও ধর্ম সমার্থবোধক না হলেও ধর্মই সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতি রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি,

www.pathagar.com

ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দর্শনমূলক আন্দোলন অভিযানেও প্রভাবিত হতে পারে। Oswald Spengler-এর মতে, একটি সমাজের সংস্কৃতি প্রথমে উৎকর্ষ লাভ করে। তারই ব্যাপক ও উৎকর্ষের ফলেই গড়ে ওঠে সভ্যতা।

আরবিতে সাক্কাফাহ হলো সংস্কৃতি, ইংরেজিতে যা Culture। তাহযিব শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহার হয়। সাক্কাফাহর শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ হলো : চতুর, তীব্র, সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সচেতন-সক্রিয় মেধাশীল হওয়া। আরবি সাক্কাফাহ অর্থ সোজা করা, সুসভ্য করা ও শিক্ষা দেয়া , পরিশুদ্ধ করা বা সংশোধন করা।

Philip Baghy মতে, মানসিক লালন ও পরিশুদ্ধকরণেরই নাম হচ্ছে কালচার। অনতিবিলম্বে উন্নত সমাজের চাল-চলন, রীতি-নীতি, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদি এর আওতায় গণ্য হতে লাগলো।

ম্যাথু আর্নুল্ড তার Culture and Anarehy গ্রন্থে ১৮০৫ সনের পরে ইংরেজি প্রথম ব্যবহার করেছেন। A.L. Krochs and Kluck Halm এর সূত্র উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এর একশ' একষট্টিটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এবং তার মতে এমন সংজ্ঞা হওয়া উচিত যা মানবজীবনের সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হবে ধর্ম, রাজনীতি, রাষ্ট্রক্ষমতা, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রকৌশল বিদ্যা, ভাষা, প্রথা-প্রচলন ইত্যাদিতে এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে এবং মানবীয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা মতাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় বিজ্ঞানক্ষমতা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসকে এর মধ্যে শামিল মনে করেছেন। টি.এস. ইলিয়ট কালচার শব্দটির তাৎপর্য বর্ণনায় বলেছেন :

চাল-চলন ও আদব-কায়দার পরিশুদ্ধতাকেই কালচার বা সংস্কৃতি বলে।

ম্যাথু আর্নুল্ড তার Culture and Anarehy গ্রন্থে শব্দটির অর্থ লিখেছেন : কালচার হলো মানুষকে পূর্ণ বানাবার নির্মল প্রচেষ্টা। অন্য কথায় কালচার হলো পূর্ণতা অর্জন।

Mantesquev এবং B. Wilson এর দেয়া সংজ্ঞাকে অতীব উত্তম বলে মনে করেন। আর তাহলো– এক বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষকে অধিকতর বুদ্ধিমান ও সচেতন বানানো এবং সুস্থ বিবেকবুদ্ধির উৎকর্ষ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে অব্যাহত চেষ্টা করা এবং তার মতে, কালচার ধর্ম হতেও ব্যাপক

www.pathagar.com

অর্থবোধক। তার গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক মুহসিন মেহেদী কালচার সম্পর্কে বলেছেন, এভাবে কালচার জীবনধারা থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কালচার হলো মানুষের আত্মার সাধারণ জমিনকে পরিষ্কার করা এবং তার কর্ষণের যোগ্য করে তোলা।

চিন্তাবিদ ফারাবি কালচার শব্দের দুটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। একটি সমাজকেন্দ্রিক, অপরটি মানবিক। কালচার হচ্ছে এমন পূর্ণরূপ যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নৈতিক আইন-বিধান, রসম-রেওয়াজ। মানবীয় কালচার হচ্ছে মানবাত্মার পরিপূর্ণ মুক্তির দিকে ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন।

তমুদ্দুন বলতেও দুটি বুঝাবে। একটি হলো সুসভ্য হওয়ার পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি মানব সমাজের পূর্ণাঙ্গ ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত রূপ। সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ ভাবধারার নাম আর তামাদ্দুন বা সভ্যতা হলো বাহ্য প্রকাশ।

জীবনচর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি বলেছেন বদরুদ্দিন ওমর। মানুষের জীবিকা, তার আহার-বিহার, চলাফেরা, তার শোক-তাপ, আনন্দ-বেদনা, অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা-সাহিত্য, ভাষা, তার দিন-রাত্রির হাজারো কাজকর্ম সব কিছুর মাধ্যমেই তার সংস্কৃতির পরিচয়।

আবুল মনসুর আহমদের মতে, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় রিফাইনমেন্ট, আরবিতে বলা হয় তাহযিব, সংস্কৃতি শব্দটা সেই অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি বলেন, কোনো সমাজ বা জাতির মনে কোনো এক ব্যাপারে একটা স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার বিধি মোটামুটি সর্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টর, আচার-আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করলেই ঐ ব্যাপারে ঐ মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হয়ে থাকে।

মোতাহার হোসেন চৌধুরীর ভাষায় : 'সমাজ সাধারণভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে। মানুষ আবার নিজেকে গড়ে তোলে শিক্ষা-দীক্ষা ও সৌন্দর্য সাধনার সহায়তায়। এই যে নিজেকে বিশেষভাবে গড়ে তোলা এরই নাম কালচার। তাই কালচার্ড মানুষ স্বতন্ত্র সত্তা, আলাদা মানুষ। নিজের চিন্তা, নিজের ভাবনা, নিজের কল্পনা বিকাশ না ঘটে কালচার্ড হওয়া যায় না।'

একটি রাষ্ট্রের সব রকম নাগরিক মিলেই রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, ধর্ম ও ভাষার দিক দিয়ে না হলেও এখানে একই রাষ্ট্রে বাস করেও এক কালচার নাও হতে পারে। যেমন– বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কালচার। ভাষাগত ঐক্য থাকলেও ধর্মগত কালচারের পার্থক্য আছে, আবার ভৌগোলিক কারণেও কালচারের পার্থক্য হয়। কালচারের ধারক-বাহক হলো গ্রামাঞ্চল। গ্রামের মানুষের খাওয়া-

www.pathagar.com

পরা, চলাফেরা, আমোদ-আহ্লাদ, শোক-মাতম, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি ভূত-প্রেতের গল্প বলার কাহিনী কিংবদন্তি। এই সব আবার সমাবেশের সমষ্টিই আমাদের জাতীয় কালচার। এই কালচার মূলত পল্লীর সম্পদ। অন্যদিকে শহরে– গ্রাম থেকেই মানুষ শহরে আসে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিদেশ থেকেও লোকজন আসে, তাদের আলাপ-আলোচনা, কথা-বার্তা, খাওয়া-পরা এক নয়, ভিন্ন। একসাথে বসবাস করে মানুষ ভালোটাই গ্রহণ করে থাকে। এই ভাবেই তাদের কালচার পরিশীলিত হয়, সংস্কার হয়। যে মন ও মস্তিষ্ক মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু হতে পৃথক করে সে মনের বিকাশের নাম কালচার, মস্তিষ্কের বিকাশের নাম সভ্যতা। তিনি বলেন, 'সভ্যতাকে ভালবাসো, সৌন্দর্যকে ভালবাসো, ভালবাসাকে ভালবাসো। বিনা লাভের আশায় ভালবাসো, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালবাসো এরই নাম সংস্কৃতি। অনেকে সংস্কার মুক্তিকেই সংস্কৃতি মনে করে। উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না। কিন্তু তা সত্য নয়, সংস্কার মুক্তি সংস্কৃতির একটা শর্ত মাত্র।

আবুল ফজল বলেন : 'কালচার শব্দের ধাতুগত অর্থ কর্ষণ অর্থাৎ সোজা কথায় চাষ করা। জমি রীতিমত কর্ষিত না হলে যত ভালো বীজই বপন করা হোক না কেন তাতে ভালো ফসল কিছুতেই আশা করা যায় না। মন জিনিসটাও প্রায় জমির মতোই। মনের ফসল পেতে হলে তারও রীতিমতো কর্ষণের প্রয়োজন।'

ড. আহমদ শরীফের মতে : Culture বা সংস্কৃতি একটি পরিশ্রুত জীবন চেতনা। ব্যক্তিচিত্তেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। এ কখনো সামগ্রিক বা সমবায় সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্য দেশে-কালে-জাতে এর প্রসার আছে, কিন্তু বিকাশ নেই। অর্থাৎ এ জাতীয় কিংবা দেশীয় সম্পদ হতে পারে কিন্তু ফসল হবে ব্যক্তিমনের, কেননা সংস্কৃতি ও কাব্য, চিত্র ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো স্রষ্টার সৃষ্টি। কালচার সাধারণের সম্পদ ও ঐতিহ্য এবং পরিচিত হয় দেশীয় বা সংস্কৃতির নামে। যেমন, হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবন এবং বাণীর যে সংস্কৃতি প্রকাশ ঘটেছে তাই ইসলামি বা মুসলিম সংস্কৃতি বলে পরিচিত।'

ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদী তাঁর 'ইসলামিসংস্কৃতির মর্মকথা' বইতে লিখেছেন, 'সংস্কৃতি কাকে বলে তাই সর্বপ্রথম বিচার্য। লোকেরা মনে করে জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, নিয়ম-নীতি, শিল্পকলা, ভাস্কর্য ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনী সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতার ধরন-বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্রনীতিই হলো সংস্কৃতি। কিন্তু আসলে এসব সংস্কৃতি নয়। এসব হচ্ছে সংস্কৃতির ফল প্রকাশ। এসব সংস্কৃতির

www.pathagar.com

মূল নয় সংস্কৃতি-বৃক্ষের পত্র-পল্লব মাত্র। এসব বাহ্যিক রূপ ও প্রদর্শনীমূলক পোশাক দেখে কোন সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা যেতে পারে বটে, কিন্তু আসল জিনিস হলো এসবের অন্তর্নিহিত মৌল ভাবধারা, তার ভিত্তি ও মৌল নীতির সন্ধান করাই আমাদের কর্তব্য।'

এ, এস ইলিয়, এম, জেড, সিদ্দিকী ও মাওলানা মওদূদীর পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে চিন্তা ও মতাদর্শের পরিশুদ্ধি, পরিপক্বতা ও পারস্পরিক সংযোজন, যার কারণে মানুষের বাস্তব জীবন সর্বোত্তম ভিত্তিতে গড়ে উঠতে এবং পরিচালিত হতে পারে। ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীমের মতে, 'মানব জীবনের দুইটি দিক। একটি বস্তুগত আর দ্বিতীয়টি আত্মিক বা প্রাণ। এই দুটি দিকেরই নিজস্ব কিছু দাবি-দাওয়া রয়েছে। মানুষ এই উভয় দাবি-দাওয়া পূরণে সব সময়ই ব্যস্ত থাকে। আত্মার দাবি আধ্যাত্মিকতার আকুল আবেদন। সে দাবি পরিতৃপ্তির জন্যে তার মন ও মগজে সর্বদাই চিন্তা ও ব্যতিব্যস্ত করতে থাকে। মানুষের বস্তুগত ও জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনার কাজ করে তার ধর্ম, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন তার মনের ক্ষুধা মিটায়। বস্তুত যেসব উপায়-উপকরণ সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগময় ভাবধারা এবং মন ও আত্মার দাবি পূরণ করে তাই হচ্ছে সংস্কৃতি। নৃত্য, গীত, সঙ্গীত, কাব্য, ছবি আঁকা, প্রতিকৃতি নির্মাণ, সাহিত্য চর্চা, ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস এবং দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা একটি জাতির সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ মাধ্যম। মানুষ তার অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই এইসব কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এইগুলো থেকে তৃপ্তি-আনন্দ-স্ফূর্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করে। দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা, কবির রচিত কাব্য ও গান, সুরকারের সঙ্গীত এসবই মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবধারাই প্রকাশ করে। এসব থেকে মানুষের মন তৃপ্তি পায়, আত্মার সন্তোষ ঘটে আর এই মূল্যমান ও আবেগ-উচ্ছ্বাসই জাতীয় সংস্কৃতির রূপায়ণ করে।'

আবুল মনসুর আহমদ পাকবাংলার কালচার বইতে লিখেছেন– 'মানুষের আনন্দের ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধার মতোই তীব্র, সুস্থ ও স্বাভাবিক পথ নির্মাণ করতে না পারলে আনন্দের জন্য মানুষ পাপের পথে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে। তার ওপর আবার পূর্বাদিতে মানুষের আনন্দ ক্ষুধার জোয়ার আসে। সেই সময় সাংস্কৃতিক আনন্দ অনুষ্ঠানের পিপাসা না মিটলে তৃপ্ত না হলে কু-পথে গিয়ে পিপাসা মেটাবেই।

www.pathagar.com

'সংস্কৃতি মানব প্রকৃতির অন্তর্গত চাহিদা পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতারই ফসল। তা মানুষকে নিছক পশুর স্তর থেকে উন্নীত করে ভিন্নতর সত্তা দান করে। ফলে মানুষের নিতান্ত জৈবিক কামনা-বাসনা ও তার পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র ও পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।'

মানুষ নিম্ন শ্রেণীর পাশবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য উৎকর্ষ ও উন্নয়ন লাভ করে উচ্চতর মানবীয় মূল্যমানে ভূষিত হয়। মহান স্রষ্টা তাকে বিবেক-বুদ্ধি এবং মন-মানস দিয়ে ধন্য করেছেন। যদিও মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও মননশক্তি, খোদার বিশেষ দান, না মানুষ নিজেরই চেষ্টা ও শ্রম-সাধনায় তা অর্জন করে নিয়েছেন। তা নিয়ে বির্তক আছে।

বুদ্ধি-বিবেক, মন-মনন, চিন্তাশক্তি সবই ক্রমবিকাশের ফসল আর তা নিছক শ্রমলব্ধ ও অর্জিত গুণ বিশেষ।

পাশ্চাত্য দার্শনিক ডিউই বলেনঃ Culture means at least something cultivated something repened. It is opposed to the raw and crude অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে এমন কিছু বুঝায় যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমার্জিতের পরিপন্থী।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংস্কৃতিকে দুইভাগ করে বলেন যে "দুনিয়াকে সর্বস্ব মনে করে মানুষ যে চিন্তা চেতনা লালন করে আসছে দুনিয়াকে ভোগ করার লক্ষ্যে, সে চিন্তা চেতনা প্রসূত সংস্কৃতিই অপসংস্কৃতি। অতএব সংস্কৃতিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি প্রকৃত সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি মানবতা, মানুষের বিকাশ বুঝায়। আর অন্যটি অপসংস্কৃতি যা মানুষের সমাজ পশুত্ব এবং বর্বরতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে।

ড. ওসমান ফারুক বলেন, সংস্কৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া হয়। এপার সংস্কৃতি ওপার সংস্কৃতি, পশ্চিমা সংস্কৃতি, পূর্বের সংস্কৃতি। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞাই থাকে তা হলো একটি এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কিসে ঘটে সেটিই সে এলাকার সংস্কৃতি। আচার ব্যবহার ইত্যাদির প্রতিফলনই হলো সংস্কৃতি। আমরা যে গ্রামে বাস করি সে গ্রামের কৃষ্টি সকাল বেলার ফজরের আজান শুনে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে ক্ষেতে কাজ করতে বেরিয়ে যায়, এটিই আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ।

www.pathagar.com

একটি বিশেষ এলাকার মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং চিন্তাধারার যে প্রতিফলন সেটিই হচ্ছে সে দেশের সংস্কৃতি। নৈতিকতাবিহীন যে সংস্কৃতি মানুষের মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে না বরং মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটিয়ে দেয় সে সংস্কৃতি কখনো গ্রহণীয় সংস্কৃতি হতে পারে না। কাজেই মূল সত্তা বিবর্জিত সংস্কৃতি তা যেখান থেকেই আসুক না কেন সেটি কখনো আমাদের সংস্কৃতি হতে পারে না। তা কখনো কোনো সভ্য, সমাজের সংস্কৃতি হতে পারে না। যে সংস্কৃতি মানুষের সমাজে অশ্লীলতা এনে দেয়, মানুষের সমাজে সন্ত্রাস এনে দেয় সে সংস্কৃতি কোনো গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি নয়। ইসলামের মাঝে যে মানবতাবোধ রয়েছে, ইসলামের মাঝে যে সহমর্মিতা রয়েছে, ইসলাম যে শিক্ষা দেয় সেগুলো আমাদের সংস্কৃতির অংশ।

ইসলামি সংস্কৃতি বা তমদ্দুন সম্পর্কে আলোচনা করে ড. হাসান জামান বলেন, "তমদ্দুন কথাটি আরবি মাদানুন" থেকে এসেছে মাদান্তন মানে শহর। শহরের বুকেই গড়ে উঠেছিল প্রথম সভ্যতা, গোড়া পত্তন হয়েছিল সংস্কৃতির। এর ভেতরই হয়ত পাওয়া যাবে তমদ্দুন কথাটির সার্থকতা।

বাংলাভাষায় সাধারণত তমদ্দুন বলতে সংস্কৃতি কথাটা ব্যবহার করা হয় তমদ্দুন বা সংস্কৃতি দিকনির্দেশ করে।

সমাজবিজ্ঞানে কিন্তু আমরা মার্জিত রুচি আর মার্জিত রুচিহীনতার সংঙ্গে পরাস্তার পার্থক্য দেখিয়ে তমদ্দুনের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করি না। কালচার আর আন-কালচার্ডের পার্থক্যই আমাদের সবার মাপকাঠি হয় না। ব্যাপক অর্থে- আমরা ব্যবহার করি তমদ্দুন কথাটা। তবে সবচাইতে বোয়া (Boas) ও টাইলর (Tulor) তার জেনারাল অ্যানথ্রোপলজি" (-General Anthreplogy-p-p-5)তে কালচার বা তমদ্দুনের সংজ্ঞাই ভেতরে উল্লেখ করেছেন ১. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ২. অনুভূতিশীল মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক ৩. মানসিক হাবভাব-ধর্ম নীতি সৌন্দর্য জ্ঞান, "তমদ্দুন" বলতে আমরা বুঝি সামাজিক প্রতিষ্ঠার যন্ত্রাদি প্রত্যয়। (ideas) ধর্ম পাশ্চাত্য অর্থে। নীতি আইন আচার ব্যবহার এসবেরই সমষ্টি। টাইলর তাঁর প্রিমিটিভ কালচার "এ তমদ্দুনের এই ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন : Culture is that Complex which includes knowledge belief Art Moral law Custom and other capabilities and habits an acquaired by man as a member at society.

www.pathagar.com

সংস্কৃতি সম্পর্কে হাসান আইউবী বলেন, আরবি ভাষায় 'ছিকফুন' অথবা 'ছুকফুন' শব্দটি 'লাযেম' (অকর্মক্রিয়া) ও মুতাআন্দি (সকর্মক্রিয়া) উভয় এর পদেই ব্যবহৃত হয়। যখন 'লাযেম' অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় – সে সভ্য বা সংস্কৃতিবান হয়েছে। আর যখন মুতায়ান্দি হয় তখন বলা হয়ে থাকে 'ছাকক্বাফতোহু. অর্থ আমি তাকে সুসভ্য সংস্কৃতিবান বা সুসজ্জিত করেছি। আবার আরবি 'ছাকাফত' শব্দ নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় যথা :

১. দক্ষতা, নিপুণতা, কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা অর্থে, যেমন– 'ছাকাফা ফুলানুন ছাকাফাতান' অমুক ব্যক্তি খুব বুদ্ধিমান ও কুশলী হয়েছে।

২. প্রভাবশালী, বিজয় অর্থে 'ছাকাফাত' ব্যবহৃত হয় 'ছাকাফাতোহু ফি মাকানিন কাযা' আমি অমুক স্থানে পেয়েছি। তার উপর বিজয় লাভ করেছি। 'ইন ইয়াছ কাফুকুম ইয়াকুনো লাকুম' যদি তারা তোমাদের উপর বিজয়ী হয় অথবা প্রাধান্য লাভ করে তবে অবশ্য তারা তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে।

৩. 'ছাকাফাত' শব্দটি সোজা করে অথবা যোগ্যতা সৃষ্টি করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে– 'ছাকিফতোর রূম্হা' আমি বর্শাকে সোহা করেছি, যাতে লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। 'ছাকাফাত' শব্দটি যখন কোনো আচরণ বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত তখন তা আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে পরিভাষা ও পরোক্ষভাবে বিশেষ আচরণকে বুঝায়। আমরা বর্তমান পর্যায়ে 'ছাকাফাত' বলতে সুরুচি সম্পন্ন সংস্কৃতিবান, উৎকর্ষ সাধন এবং একটি সুষ্ঠু নৈতিক পদ্ধতি ও উন্নত মূল্যবোধের বুনিয়াদে সমাজ ও সভ্যতার পরিচালনাকে 'ছাকাফাত' বা সংস্কৃতি বলি। মানব চরিত্রে এক উন্নততর অবস্থা বা আচরণের নামই হচ্ছে– 'ছাকাফাত' বা সংস্কৃতি।

প্রখ্যাত পন্ডিত আল্লামা 'যমখশরী' 'আসাসআল বালাঘা' গ্রন্থে লিখেছেন– 'ছাকাফাত' শব্দের পরিভাষাগত অর্থ হচ্ছে আদব-কায়দা শেখানো, সুসভ্য করে গড়ে তোলা। মানুষ বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হয়েও যদি উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ হতে বঞ্চিত হয় তবে প্রকৃতপক্ষে তার আদৌ গুরুত্ব নেই।

প্রকৃত সংস্কৃতি ও সভ্যতার তখনই উদ্ভব ঘটে যখন মানুষ দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রস্তুতি সহকারে সভ্যতা গড়ে তোলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সামান্য শব্দগত পার্থক্য ছাড়া 'ছাকাফাত' শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যই "আলমুহিত" "আলক্বামুস" "মুখতারুস সিহাহ" ও "আসাস-আল বালাঘা" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

যখন "ছাকাফাত" আভিধানিক ও পরিভাষাগত অর্থ সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিক উৎকর্ষ ও উন্নত প্রশিক্ষণ বুঝায় তখন এর প্রয়োগগত অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে? এ আর কিই বা তাৎপর্য হতে পারে? কোনো শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে মানুষের অনুভূতি ও চেতনাশক্তিই মূল উৎস হিসেবে কাজ করে। এর বিপরীত কখনও হয় না যে, শব্দই মানুষের অনুভূতি ও চেতনার উদ্ভব ঘটায়।

এ কারণেই একজন গ্রন্থকার, সাহিত্যিক ও প্রভাষকের সাফল্য এরই উপর যে তার রচনাশৈলী, চিন্তা, লেখা ও ভাষণে যখন সাধারণ গণমানুষের চিন্তা, কর্ম, আচরণ, অনুভূতি ও চেতনার পিরহান পরিধান করে সুশোভিত ও সুসজ্জিত হয়। তার প্রকাশিত ভাষা ও ছন্দে যখন সমাজের সাধারণ মানুষের পুঞ্জিভূত ও সঞ্চিত চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে– তার কণ্ঠে যখন গণচেতনা ও অনুভূতির বিচ্ছুরণ ও সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়।

দিন ও সংস্কৃতি

আমরা বিশ্বাস করি দিন হল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর নির্দেশিত পথ বা জীবন বিধান। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির পর পৃথিবীতে প্রেরণ করে তার চলার পথ হিসেবে যে বিধান দান করেছেন, সেই বিধান বা নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যম ইহ ও পরকালীন অনন্ত জীবনে জান্নাতে সুখে থাকবে।

দিন হল আল্লাহর নির্দেশ, জীবন ব্যবস্থা, পরিচালনা পদ্ধতি আল্লাহ কোরআনে বলেছেন "ইন্নাদদীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম" (*সুরা আল ইমরান, আয়াত-১৯*) অর্থ ইসলামই আল্লাহর মনোনীত এক মাত্র দিন বা জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ কোরআনে আরো বলেছেন, "কুনতুম খাইরুল উম্মাতে উখরিজাত লিন্নাস তামুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার ওয়াতুমিনুনা বিল্লাহ" (*সুরা আল ইমরান, আয়াত-১১০*) অর্থ তোমাদের সৃষ্টি মানবজাতির কল্যানার্থে তোমরা ন্যায় কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। সম্ভবত তোমরাই সফল কাম হবে।

ধারণ থেকেই ধর্ম অথাৎ যা ধারণ করে। পানির ধর্ম নিচের দিকে গড়ানো, আগুনের ধর্ম পুড়ানো, ওষুধের ধর্ম রোগ সারানো, আলোর ধর্ম অন্ধকার তাড়ানো, ইসলাম আমাদের দিন বা ধর্ম ইসলামকে সম্পূর্ণ ধারণ করলেই পূর্ণ

www.pathagar.com

মুসলমান হয়। ইসলাম হল আল্লাহর নির্দেশিত রীতি নীতি যা আল-কোরআনে লিপিবদ্ধ।

সংস্কৃতি হল– ধর্মীয় উপাদান বা জীবনাচর্চার পরিশীলিত উন্নত মার্জিত জীবন চর্চাই সংস্কৃতি। ধর্ম বিশ্বাসই হল মানব জীবনের প্রেরনার উৎস। হযরত আদম (আ:) পৃথিবীর প্রথম মানব। তিনিই সংস্কৃতিক সূচনা করেন। আদম (আ:) এর যাপিত জীবনই সংস্কৃতি শুরু। যুগে যুগে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে শেষ নবী রাসূল (সা:) সময় ইসলামি সংস্কৃতির পূর্ণতা পায়।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে ২৫ জন নবী ও রাসূলের কাহিনী বইয়ে মাওলানা জাকির হোসেন আজাদী লিখেছেন। হযরত আদম (আ:) কে আল্লাহ সৃষ্টির পর তাঁর দেহে রূহ ফুকে দিলেন "রূহ" দেহে প্রবেশ করা মাত্রই নড়ে উঠল এবং সাথে সাথে হাঁচি হওয়ার সাথে তিনি বলে উঠলেন "আলহামদুলিল্লাহ" সকল প্রসংশা আল্লার জন্য। তখনি আল্লাহর তরফ থেকে জবাব আসল "ইয়ারহামুকাল্লাহ" তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। মহান আল্লাহর নির্দেশে, জান্নাতে সুখ শান্তিতে বসবাস করেও হযরত আদম (আ:) এর মনে সুখ-শান্তি ছিল না। আল্লাহর বিষয়টি অজানা ছিলনা একদিন আদম (আ:) গভীর নিদ্রায় থাকা অবস্থায় তার বাম পাজরের হাড্ডি থেকে পরমা সুন্দরী বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেন অপূর্ব সুন্দরী বিবি হাওয়া ঘুমন্ত আদম (আ:) এর মাথায় হাত বুলালেন। কোমল হাতের স্পর্শে হযরত আদম (আ:) এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি সুন্দরী রমণী দেখে বিস্ময় হলেন। আল্লাহ আদম (আ:) কে লক্ষ্য করে বললেন এই রমণীই তোমার জীবনসঙ্গী তোমার দুঃখ-সুখের সম ভাগীনি হবে।

হযরত আদম (আ:) বিবি হাওয়াকে হাতে ছুঁইতে উদ্যত হইলে আল্লাহর তরফ থেকে সতর্ক বাণী উচ্চারন হল, "হে আদম! বিরত থাক, বিয়ের পূর্বে স্পর্শ করিও না তা তোমার জন্য বৈধ হবে না। হযরত আদম (আ:) আল্লাহকে বিবি হাওয়ার সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। মহান আল্লাহ আদম (আ:) এর সাথে বিবি হাওয়ার বিয়ে পড়িয়ে দেন এবং বিয়ের খুৎবাহ স্বয়ং আল্লাহ পাঠ করেন। বিয়ের পর ফেরেশতারা আনন্দ, উল্লাস করেছিলেন। হযরত আদম (আ:) অপূর্ব সুন্দরী বিবি হাওয়াকে পূনরায় তাকে ছুতে উদ্যেত হলে আবারও আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসল , "হে আদম! বিবি হাওয়ার মহরানা পরিশোধ কর। তার পূর্বে তাকে স্পর্শ করিও না বৈধ হবে না।" আদম আঃ বল্লেন হে আল্লাহ আমার তো কিছুই নেই । আল্লাহ বলেন, "হে আদম!

www.pathagar.com

দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আমার প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ (সা:) এর উপর বকশিশ দাও তোমার মহরানা আদায় হয়ে যাবে"। হযরত আদম (আ:) এর জীবন পদ্ধতি থেকেই ইসলামি কালচারের উৎপত্তি বা শুরু।

ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে সেইটি হল ইসলামি সংস্কৃতি। যার মূল ভিত্তি কোরআন সুন্নাহ। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম ইসলামি সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বরূপ বইয়ে পুস্তকে লিখেছেন "আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামি শারী'আতের আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের জীবনের সকল কর্মকাই ইসলামি সংস্কৃতির আওতাভুক্ত, যা মানবতার আদর্শ মহাম্মদ (সা:) এর পদাঙ্ক অনুসরণে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ইসলামি চিন্তাবিদগণ ইসলামি সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিম্নরূপ:

১. বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ অধ্যাপক হাসান আইয়ুব বলেন,

'কুরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকা- ও ক্রিয়াকলাপ ও আচরণই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি।

২. আব্দুল মান্নান তালিবের মতে, 'ইসলামী জীবন চর্চাই ইসলামি সংস্কৃতি। মুসলমানরা যেভাবে তাদের জীবন গড়ে তোলে ইসলামি সংস্কৃতি ঠিক তেমনি রূপ লাভ করে। মুসলমানরা যখন পুরোপুরি ইসলাম তথা ইসলামী বিধান মেনে চলে তখন তারা পূর্ণ ইসলামি জীবন-যাপন করে।

৩. এ. জেড. এম শামসুল আলম ইসলামি সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'মানুষের জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের পর যে সমস্ত আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম, রুচি, চেতনা মানব জীবনকে সুন্দর করে এবং জীবনে আনে অনাবিল সুখ ও শান্তি সে সমস্ত আচার-আচরণকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা যায়, যদি তা ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক হয়। ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষ্য হলো জীবনকে সুন্দরতর করা, সুখ-শান্তি ও কল্যাণময় করা। ইসলামি সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রতীক হলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা:)। আর তাঁর সুন্নাহই হলো মৌলিক মুসলিম সংস্কৃতি।

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালের সম্মেলনের একুশ সংখ্যক প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুবকদের চরিত্র এবং মানসিকতা গঠনের জন্য ধর্ম এবং আত্মিক আদর্শ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর সকল দেশেই

www.pathagar.com

এই গুরুত্ব অল্প বিস্তর তারতম্যসহ বিদ্যমান। সেই কারণে ইউনেস্কো মনে করে যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চৈতন্যের মূলে ধর্মের প্রভাব আছে। সুতরাং পৃথিবীর সকল দেশের কর্তব্য হচ্ছে ধর্ম ও আত্মিক চৈতন্যকে যথার্থ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা নির্ধারণের সময় ধর্মের স্থান সম্পর্কে সচেতনভাবে চিন্তা করা। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউনেস্কোর প্রস্তাব হচ্ছে:

১. একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সে দেশের ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা।

২. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আত্মিক চৈতন্যকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান।

৩. ধর্মের একটি আন্তর্জাতিক বিশিষ্টতার্থক এবং সর্বমানববাদী রূপ আছে সেই রূপকে সংরক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে সমন্বিত করা।

৪. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিতে যে আত্মিক মূল্যবোধ বা স্পিরিচ্যুয়াল ভ্যালুজ রয়েছে আপন সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে সে মূল্যবোধকে মর্যাদা দেয়া।

ইউনেস্কোর এ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জনসাধারণের কাছে ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কৃতির অঙ্গনে একটি জীবন্ত শক্তিরূপে সক্রিয়। বাংলাদেশেও প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রেরণা সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান সকলের ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাসটি জীবনের প্রেরণার উৎস। এদেশের বিভিন্ন উৎসবের উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেগুলোর প্রায় সব কটিই ধর্মভিত্তিক। ধর্মভিত্তিক হয়েও সকল উৎসব আয়োজনের মধ্যে একটি উদারতা, সহনশীলতা এবং সকল শ্রেণির মানুষকে একসঙ্গে গ্রহণ করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সংস্কৃতির স্বরূপ প্রসঙ্গে কবি আসাদ বিন হাফিজ তার ইসলামি সংস্কৃতিক বইয়ে উল্লেখ করেছেন- সংস্কৃতি বস্তুগত, বিশ্বাসগত এবং নন্দনগত তিনটি স্বরূপ বিদ্যমান। বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণকেই বুঝানো হয়। বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে ধর্মীয় আদর্শ কিংবা বিভিন্ন মতাদর্শকে বুঝানো হয়। আর নন্দনগত সংস্কৃতি হচ্ছে তাই, যা মানুষের মনে

www.pathagar.com

রসবোধের জন্ম দেয়। আর শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, চলচ্চিত্র, নাটক সঙ্গীত ইত্যাদি।

মানুষের সংস্কৃতির মূলে আছে তিনটি প্রচেষ্টা –

১. প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজ আয়ত্তে আনা ও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসকে সহজে লাভ করা।

২. জীবনকে সুশৃংখল করার জন্য কতকগুলো রীতিনীতি গড়ে তোলা। কিভাবে বাঁচ, কেন বাঁচব, ভালভাবে বাঁচা বলতে কি বুঝায়- তার উত্তর পেয়ে জীবনকে সেভাবে পরিচালিত করা।

৩. জীবনের একঘেয়েমি মোচন করা; অবকাশ মুহূর্তকে আনন্দময় করে তোলা। প্রাত্যহিক জীবনে সৌন্দর্য আরোপ করা।

সংস্কৃতির বিভাজন এবং মূল প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে বর্ণিত এই কার্যগুলোই কিন্তু সংস্কৃতি নয়। যেমন আমরা খাবার খেয়ে থাকি। এখন এই খাবার খেয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়; কিন্তু এই ভাত-রুটি বা মাছ-গোশত খাওয়াটাই সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি হচ্ছে সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন পরিচালনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার নাম।

ইসলামি সংস্কৃতির সংজ্ঞা

আমরা যখন বুঝতে পারলাম যে, সংস্কৃতির অর্থ সুসভ্য আচরণ, শিষ্টাচার ও উন্নত নৈতিক মুল্যবোধ- যার ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তখন সংজ্ঞার আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামি সংস্কৃতি বলতে "আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামি শরিয়তের বুনিয়াদে মানুষের সামগ্রিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে বুঝায়। মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই ইসলামি সংস্কৃতির আওতাভুক্ত যা মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (সা:) এর পদাঙ্ক অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

এক কথায় ইসলামি সংস্কৃতির সংজ্ঞা হলো : কুরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে পরিচালিত মানবজীবনের সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ।

এভাবেই সমস্ত বাকবিতণ্ডা ও মতবিরোধ থেকে আত্মরক্ষা করতে সংস্কৃতি লাগামহীন স্বার্থবোধক সংজ্ঞা পেশ করে। কেননা সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে অনেক

www.pathagar.com

জটিলতা ও পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থাকার সংস্কৃতির অত্যন্ত ন্যক্কারজনক হীন-ব্যাখ্যাই উপস্থাপিত করেছেন। একজন গ্রন্থাকার বলেন, 'সংস্কৃতি হচ্ছে শুধু দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের নাম।' কিন্তু পর্যালোচনার পর দেখা যায় যে, আচরণ ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ কেউ সংস্কৃতির সংজ্ঞা পেশ করে বলেছেন, মানব জীবনের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানই হচ্ছে সংস্কৃতি। তারা সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থ ও প্রচলিত পরিভাষা এবং বাস্তব জ্ঞানের যোগসূত্রকে কোনো গুরুত্বই প্রদান করেননি। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা এখানে সংস্কৃতির ব্যাপক দিকের আলোচনা হতে বিরত রয়েছি। কারণ এর সমস্ত দিকের আলোচনা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় বহির্ভূত।

ইসলামি সংস্কৃতির উৎস

আমাদের দৃষ্টিতে ইসলামি সংস্কৃতির প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে "কুরআন ও সুন্নাহর অনুসৃত নীতি ও আচরণের নাম"। তাই আমরা নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কুরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতির মূল উৎস।

প্রকৃতপক্ষে এ দু'টো উৎস প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অতুলনীয় ও দৃষ্টিহীন উৎস। এ হচ্ছে অতীত শিক্ষা, সভ্যতার চূড়ান্ত প্রতিবেদন। তাছাড়া একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহই কালের বিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অতিরঞ্জন ও সংকলনের মারাত্মক ত্রুটিসমূহ হতে মুক্ত।

আল কুরআনের অপরিবর্তনশীলতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কুরআনেই বর্ণিত রয়েছে – "আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এবং আমি এর হিফাজতকারী" (হিজরত-৯)। এ কারণেই কুরআনের কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সাধ্য কারও নেই।

পবিত্র সুন্নাহ

পবিত্র সুন্নাহ যে ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম উৎস এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন :

"হে নবী! আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে করে আপনি মানুষের নিকট এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও শিক্ষা তুলে ধরেন" (নাহল-৪৪)।

www.pathagar.com

এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে রাসূলের সুন্নাহ তথা শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণের নির্দেশ দান করে বলেছেন–

"রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো; আর রাসূল যা করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো"। (হাশর-৭)

বাঙালি সংস্কৃতি এবং ইসলামি তমদ্দুন ও সাহিত্য

বাংলাদেশ মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল পাল ও সেন বংশের আমলে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈষ্ণববাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাভাষা ও সাহিত্যে বৈরাগ্যবাদ, মায়াবাদ ও নির্মাণবাদের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পালি ও প্রাকৃত ভাষার মারফত এই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বাংলা সংস্কৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ...তারপর এল তুর্কি বিজয়। বাংলাভাষার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব যুগের অভ্যুদয় হলো। বিজয়ী মুসলমানদের দরবারে বিজিতের এই বাংলাভাষা সগৌরবে স্থান পেল। দুর্বোধ্য সংস্কৃতের নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাভাষা বিকাশের নতুন পথ বেছে নিল। এর ফলে যে বিরাট লোকসাহিত্য ও পুঁথি-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও ইসলামি ভাবধারার প্রভাব বাংলাসাহিত্যে তখন থেকেই পড়তে শুরু করে। বাদশাহী পৃষ্ঠপোষকতার চেয়েও মুসলমান ফকির দরবেশদের প্রভাব এই ব্যাপারে কোনো অংশে কম নয়। তারপর বৌদ্ধ সংস্কৃতির উদার নৈতিক ভাবধারাও এদেশের ইসলামের সর্বজনীন ভাবধারার প্রসারে কম সাহায্য করেনি। ওহাবী আন্দোলনের ভারতীয় ধারা পরবর্তীকালে এদেশীয় মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে ইসলামবিরোধী ভাবধারা দূর করবার চেষ্টা করে।

ইসলামি সংস্কৃতি ও মুসলিম তমদ্দুন

মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতি এক নয়।

ইসলামি তমদ্দুনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, 'মুসলিম' তমদ্দুন ও ইসলামি তমদ্দুনের আসমান-জমিন প্রভেদ। মুসলমানদের তমদ্দুন হলেই তা ইসলামি তমদ্দুন নাও হতে পারে। জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য, বাদশাহী ও সামন্ততান্ত্রিক হাবভাব নানা কারণে মুসলমানদের তমদ্দুনে ঢুকে

www.pathagar.com

পড়েছে। কিন্তু সেগুলোকে ইসলামি তমদ্দুনের অংশ বলা যায় না। আবক্ষাসীয়দের সময় থেকেই ইসলামি তমদ্দুনে সংকীর্ণতা ঢুকে পড়ে– একজন অত্যাচারী শাসক 'খলিফা' বা নামে 'আমিরুল মুমিনিন' হলেই যথেষ্ট, তা তিনি ইসলামের সামাজিক বিধান প্রয়োগ করুন আর না করুন। সামাজিক ঐক্য বা সংহতি নিশ্চয়ই প্রয়োজন আর এটা ইসলামেরই বিধান। কিন্তু জালিম শাসনকেও 'আল্লাহর ছায়া' শাহানশাহ্ বা বাদশাহ বলে মেনে নেওয়া কিছুতেই ইসলামের নীতি অনুগত হতে পারে না। মনে রাখা দরকার যে, তথাকথিত ধর্মীয় শাসক মুখে ইসলামের নাম করে শাসন চালালেই ইসলামি শাসন হবে না। কেবলমাত্র ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সামাজিক ব্যাপারের যোগ থাকলেই ইসলামি সমাজ পাওয়া যাবে না। বাহ্যিক হাবভাব বা পোশাক-আশাকই যথেষ্ট নয়। ইসলামের নীতির সঙ্গেই সামাজিক ব্যাপারের সংযোগ হওয়া চাই। এই হিসেবেই (তথাকথিত ধর্মীয় নেতার অস্তিত্বের জন্যেই শুধু নয়) ইসলামিরাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্মীয় বা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ। জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ ইসলামি তমদ্দুনের একটা বড় কথা।

সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতি প্রবন্ধে কবি মতিউর রহমান মল্লিক বলেন, 'সংস্কৃতি' শব্দটি অর্থ-শিক্ষা বা চর্চা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, শিল্পকলা-রুচি নীতি, উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture, তমদ্দুন, মার্জনা, পরিশীলন, অনুশীলন, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা অথবা সংশোধন। মানবসমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ, একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা, কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প- সাহিত্য, বিশ্বাস-সমাজনীতি ইত্যাদি।

"Culture is that what we are". -HG Lasky অর্থাৎ সংস্কার করে যা পাওয়া যায় তা-ই সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্যে একবার সংস্কৃতি সম্পর্কিত একটি বক্তব্য দারুণ রকমের বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলো। ঐ বক্তব্য সম্পর্কে A Dictionary of Literary terms by J.A. Coddon বলেছেন :

In 1959 C. P. snow delivered a lecture in Cambridge which tells that the linkage between humanity and technology is a kind of culture. Here humanity means Arts, and technology means Science. This lecture caused a great deal of controversy.

www.pathagar.com

১৯৫৯ সালে অধ্যাপক C. P. Snow ক্যামব্রিজে প্রদত্ত এক লেকচারে বলেছিলেন : মানবতাবাদ এবং প্রযুক্তিবাদ এই দুয়ের মধ্যবর্তী যোগসূত্রই হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি।

এখানে মানবতাবাদ অর্থ সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তিবাদ অর্থ বিজ্ঞান। পরবর্তীকালে তাঁর ঐ বক্তব্য ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলো।

A.S Hornby -এর Oxford Abvanced learners English Dictionary সংস্কৃতি সম্পর্কে একাধিক তথ্য পরিবেশন করেছেন :

ক. Refined understanding and apperciation of arts, literature etc. সাহিত্য, কলা ইত্যাদির পরিশোধিত অনুধাবন এবং চিন্তাধারাই হলো কালচার বা সংস্কৃতি।

খ. State of intellectual development of a society. কোনো সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির নামই সংস্কৃতি।

গ. Particular form of intellectual expression specially in art and literature. বিশেষত সাহিত্য এবং কলার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি।

ঘ. Customs, Arts, Social institution etc of a particular group of poeple ... কোনো একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার, সাহিত্যকলা ইত্যাদিই হলো এ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ কানাডীয় ইউনেস্কো কমিশন Canadian National Commisson for UNESCO সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি সভা আহ্বান করে। দীর্ঘ আলোচনা ও মত-বিনিময়ের পর উক্ত বিশেষজ্ঞরা যে সংজ্ঞা স্থির করে তাকে তাঁরাই working difiniton বলে উল্লেখ করেন তাঁদের মতে এই সংজ্ঞাটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পরে, কেননা সংজ্ঞাটি পরীক্ষামূলক ও সংশোধনমূলক ও সংশোধন সাপেক্ষ। স্থিরকৃত সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ:

Culture is a dynamic value system of learned elements, with assumptions. conventions, beliefs and rules permitting members of a group to relate to each other and

www.pathagar.com

to the would to communicate and to develop their creative potential.

সমাজবিজ্ঞানী ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কারো মতে সংস্কৃতি হলো অতীতের ঐতিহ্য ও আগামীর স্বপ্নের প্রেক্ষিতে নির্মিত মানুষের ভাবধারা, নান্দনিক রূপ ও মূল্যবোধের সমন্বিত প্রকাশ। আবার অভিধানে সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ সন্ধান করলে হয়তো এই রকমের একটি বাক্য পাওয়া যাবে : Cultivatio improvement of refinement by education and training. The training and refinement of mind tastes and manners. The condition of being thus trained and refined. The intellectual side of civilization.

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য সত্ত্বেও আধুনিক জ্ঞান চর্চার ধারায় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা হয়েছে মানুষের সৃজনশীলতার সমুদয় ফসল-রূপে, মানুষ যা এই পৃথিবীতে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ সমস্ত কৃতি ও সৃষ্টি প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে এবং পরে মানুষের জীবনযাপনকে করেছে উন্নততর। বলা যায়, মানুষের জীবনযাত্রার সকল উপাদান এবং সমুদয় উপলব্ধি নিয়েই মানব-সংস্কৃতি।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর 'ইসলামি সংস্কৃতির রূপ' প্রবন্ধে বলেছেন : 'কালচার' কি? উৎকর্ষ বা অনুশীলন। আজকাল সাধারণত একটা বিশেষ অর্থে এর ব্যবহার করা হচ্ছে যা অর্থ হচ্ছে মানব-মনের উৎকর্ষসাধন-পদ্ধতি বা রূপায়ণ।

অনেকে 'refinement' অর্থেও কথাটার ব্যবহার করে থাকেন। আবার কারো কারো মতে মানবকল্যাণমুখিতারই নাম 'কালচার'। কেউ কেউ আবার Civilization এর কোনো তফাৎ খুঁজে পান না। এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে- অক্সফোর্ড ডিকশনারি বলে: Trained and refined state of understanding and manners and tastes, phase of these prevalent at a time or place, instilling of it by training, artificial rearing of bees, fish bacteria etc. অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো বোধ, আচরণ ও আস্বাদনের প্রশিক্ষিত রূপ। একই সময় ও স্থানের প্রেক্ষিতে যে সবের ক্রমোন্নয়ন, বলা যেতে পারে, মৌমাছি, মাছ, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি

www.pathagar.com

প্রজননের ধরনের ধীরে ধীরে যেসব পরিশীলিত রূপের চর্চা। সংস্কৃতির একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন বসনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট আলিয়া আলি ইজেতবেগভিচ, সংস্কৃতি হলো অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা।

'আমাদের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে আবদুল মান্নান তালিব বলেছেন : 'তাহযিব ও তমদ্দুন দুটো আরবি শব্দ। তমুদ্দুন শব্দটা এসেছে 'মুদন' থেকে। তা থেকে 'মাদানিয়াত' অর্থাৎ নাগরিক বোধ। অন্য কথায় নগরজীবন ভিত্তিতে যে পরিশীলিত সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে তমুদ্দুন বলা যা। তাই তমুদ্দুন সভ্যতার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে 'তাহযিব' শব্দ এসেছে 'হযব' থেকে। হাযাবা, হাযযবা, তাহযিব মানে কেটে সমান করা। যেমন বাগানের চারদিকে যে গাছের বেড়া দেয়া হয়, মালি কাঁচি দিয়ে কেটে তার মাথাগুলো তাহযিব করে। অর্থাৎ ও দু'পাশ কাঁচি দিয়ে কেটে সমান করে। কোনো একটা ডাল বা পাতা সমান করে কাটা-সীমানা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে মালির কাঁচি সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা কেটে সমান করে দেন। এভাবে পরিশীলিত জীবনধারা।'

অবশ্যি 'কালচার'-এর ধারণা বিস্তার লাভ করার পরই আমাদের দেশে তাহযিব-তমুদ্দুন এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃতি শব্দটার প্রচলন শুরু হয়।

বিভিন্ন মনীষীদের সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও বিস্তারিত আলোচনা থেকে সহজভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃতি হচ্ছে, ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন অর্থাৎ বিশ্বাসীদের জীবন আচার।

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের জীবনাচারই হলো ইসলামি সংস্কৃতি। আমাদের প্রিয় নবী (সা:) আইয়ামে জাহেলিয়াতের এক চরম সময় আবির্ভূত হন। তিনি মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে ডাকলে, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসলেন, একত্ববাদে বিশ্বাসী এ জনসমষ্টিই মুসলমান-তাঁরা মদিনায় একটি ছোট্ট ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করলে এই ইসলামি রাষ্ট্রের জনগণের চাল-চলন, আচার-আচরণ ও জীবন-পদ্ধতিই ইসলামি কালচার।

ক্রোধ সংযত করা এবং অপরাধীকে ক্ষমা করা মানুষের জন্যে তা এক উচ্চমানের নৈতিকতা। অপরাধীকে ক্ষমা করা যায় তা ছিল তখনকার মানুষের কল্পনাতীত, মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব, ভালবাসা-সম্প্রীতি মানুষকে সম্মান করা, তা কল্পনাও করতে পারেনি তখনকার মানুষ। শ্রেণীতে শ্রেণীতে হিংসার আগুন জ্বালানোই ছিল তাদের কালচার। শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য।

ইসলামি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য : (১) তাওহিদ, (২) মানবতার সম্মান, (৩) বিশ্ব ব্যাপকতা সর্বজনীনতা (৪) মানবীয় ভ্রাতৃত্ব, (৫) বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, (৬) বিশ্বমানবতার ঐক্য,

www.pathagar.com

(৭) কর্তব্য ও দায়িত্ব, (৮) পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি, (৯) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা, (১০) ভারসাম্য, সুষমতা ও সামঞ্জস্য।

এই মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তাই ইসলামি সংস্কৃতি।

রাসূল (সা:) মদীনায় যে রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন সেখানকার কালচার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তা পরশ-পাথরের মতো মানুষকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই মূলত কালচারের উৎপত্তি। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসীদের জীবনের প্রতিফলন হিন্দু সংস্কৃতি, বুদ্ধদের বুদ্ধ সংস্কৃতি, খ্রিস্টানদের খ্রিস্টান সংস্কৃতি। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে দেখা হলে বলে আসসালামু আলাইকুম। (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। এটাই মুসলিম কালচার।

হিন্দুরা বলে, নমস্কার; এটা হিন্দু কালচার। মেয়েরা মাথায় সিঁদুর পরে, এটাও হিন্দু কালচার।

মুসলমান ইন্তেকাল করলে তাকে আতর গোলাপ দিয়ে গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে কবর দেয়া হয়। মৃত্যুর পর তার লাশ আস্তে আস্তে ধরে স্থানান্তর করা হয়, কারণ ব্যথা পাবে এই জন্যে। আর হিন্দু কালচার–মৃতের বড় আদরের ছেলে দ্বারা মুখাগ্নি করানো। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধরা লাশ বাক্সে করে কবরে দেয়। তাই ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন ভিন্ন তাদের সংস্কৃতিও ভিন্ন।

মুসলমানদের বিশ্বাস মৃত্যুই শেষ নয় তারপরও জীবন আছে। শুধু স্থানান্তর হয়ে কবরে যায়– সেখানে তার দুনিয়ার ভালো কর্মের ভালো ফল, মন্দ কর্মের মন্দ ফল অর্থাৎ কবরে আযাব হবে তাই তার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয়। আর বস্তুবাদী নাস্তিকদের বিশ্বাস, মানুষ এক রকম উন্নত পশু। আল্লাহ বলে কিছু নেই। মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে ও মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুতে তার সব শেষ। তাই তার মৃত্যুর পর লাশ যাতে দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে সে জন্য মাটিতে পুঁতে ফ্যালে এবং তাকে সম্মান জানানোর জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করে। এটা নাস্তিকের সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

কাজেই ভাষাগত কারণে কোনোভাবেই সংস্কৃতির ঐক্য হতে পারে না। অঞ্চলভিত্তিকও শুধু নয়, শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমেই সংস্কৃতির ঐক্য হয়। যারা ভাষাগত কারণে সংস্কৃতির ঐক্য দাবি করে তারা আসলে আস্তিক নয়।

প্রাচীন মিসরীয়দের বিশ্বাস ছিল মৃত্যু হলো দীর্ঘ মেয়াদী ঘুম, নিদ্রা শেষ হলে সে আবার জেগে উঠবে। এই বিশ্বাস থেকে ফারাওরা মৃত্যুর পর লাশ মমি করে রাখতো। পিরামিডে, তার সাথে তার ব্যবহার্য দামি জিনিসপত্র রেখে দিত এবং পিরামিডের গায়ে তাদের জীবনের কর্মকাণ্ড সব এঁকে এবং লিপিবদ্ধ করে রাখতো। কারণ এইসব লেখা এবং আঁকা কর্মকাণ্ড দেখে সে যেন নিজেকে চিনতে পারে এবং তার ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো সে আবার ব্যবহার করতে পারে। এটাই তাদের কালচার ছিল।

বিজাতীয় সংস্কৃতি

বিজাতীয় সংস্কৃতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই মূলত সংস্কৃতির উৎপত্তি এবং প্রত্যেক ধর্মের সংস্কৃতিরই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ বিদ্যমান। এমনকি নাস্তিকেরা পার্থিব স্বার্থের জন্যে অনেক সময় সব সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করেলও মূল বিশ্বাসের পার্থক্য আছে। এখন কোনো এক ধর্মের সংস্কৃতি অন্য ধর্মের সংস্কৃতিতে বিজাতীয় সংস্কৃতি। এক ধর্মের সংস্কৃতি অন্য ধর্মের সংস্কৃতিতে বৈধ নয়। হিন্দু ধর্মে যেভাবে বিয়ের কার্য এবং অনুষ্ঠানাদি হয় তা মুসলমানদের জন্যে বৈধ নয়। খ্রিস্টানদের বিয়ে গির্জায় গিয়ে হওয়ার পদ্ধতিও ভিন্ন।

হিন্দুরা আপন বোনের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। এটা তাদের কালচার, কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ হারাম। আমাদের জন্য এটা বিজাতীয় সংস্কৃতি।

নৃত্য হিন্দু ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কালচার; হিন্দু মেয়েরা মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে দেবতার সামনে নৃত্য করে দেবতাকে তুষ্ট রাখে। এটা তাদের কালচার। মুসলমানদের জন্য নাচ-গান নিষিদ্ধ।

আমরা যে ব্যালে-নৃত্য দেখি এই ব্যালে নৃত্য জাপানিদের ধর্মীয় বিশ্বাস। পুরনো জাপানি ব্যালেনাচের অস্তিত্ব এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই। প্রাগৈতিহাসিক ঘোড়ার চিত্র দেখি, এইগুলোও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে আঁকা।

www.pathagar.com

তাদের বিশ্বাস ছিল, তীরবিদ্ধ হরিণ এবং বাইসানের ছবি এঁকে রাখলে তারা দুর্বল হবে এবং শিকার ধরতে সহজ হবে। গর্ভবতী ঘোড়ার ছবি আঁকলে ঘোড়ার বংশ বৃদ্ধি পাবে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তাদের শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

অশ্লীল সংস্কৃতি : যে সংস্কৃতি মানুষের মনুষ্যত্ব, রুচিবোধ ও নৈতিকতা ধ্বংস, অপকর্মে উৎসাহিত করে, বিভ্রান্ত করে তাই অশ্লীল সংস্কৃতি। সংক্ষিপ্ত আঁটসাঁট পোশাক পরা, স্পর্শকাতর স্থানগুলো প্রদর্শন করা, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, খোলামেলা নাচ, যৌন উন্মাদনামূলক কথার গান, যেগুলো দেখে যুবক-যুবতী সঙ্গীত ও নৃত্যের মূর্ছনায় সম্পূর্ণরূপে বিভোর, আত্মহারা ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, ন্যায়-অন্যায় বোধের বিলোপ ঘটে। সুরা পান, নেশা করা, সুরা হলো সব রকম অশ্লীলতা, চরিত্রহীনতার ও অপরাধপ্রবণতার মৌল উৎস। এই জন্যেই শরিয়তে সুরা পান, পান করানো, তৈরি ও বিক্রয় করা হারাম। সুরা পান করলে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক শক্তি সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। তার কাছে মা-বোন, কন্যা, স্ত্রীর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। স্নায়ুবিক দিক দিয়ে উচ্ছ্বাস, বিজিত হয়ে যায়। ফলে জাতির চরিত্র, মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়।

বর্তমান সময়ে চলচ্চিত্র, নাটক ও নাট্যাভিনয়, সস্তা চিত্তবিনোদনের নামে অশ্লীল, বেহায়াপনার প্রতিযোগিতা চলছে। অশ্লীল, নির্লজ্জ ও নৈতিকতা বিবর্জিত দৃশ্যাবলীর প্রদর্শনী চলছে। অবৈধ ভালবাসা ও প্রণয়াসক্তির বিচিত্র গতি-প্রকৃতি ও রোমান্টিক ঘটনা পরস্পরের আবর্তনে উদ্বেলিত, যা দর্শক বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মন-মগজ ও চরিত্রে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা তা বাস্তবে রূপদান করতে পাগলপারা হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তরুণ-তরুণী দর্শকরা। ফলে সমাজে অপহরণ, ধর্ষণ, নির্যাতন, খুন-রাহাজানি দিন দিন বেড়েই চলছে। অশ্লীল সংস্কৃতিই এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী।

সংস্কৃতিক আগ্রাসন

আগ্রাসন মানে জোর-জবরদস্তি। বিজাতীয় সংস্কৃতি, অশ্লীল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। বর্তমান গ্লোবাল ভিলেজঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিশেষ করে স্যাটেলাইট চ্যানেলের বদৌলতে আকাশ সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার চলছে। যেগুলো সম্পূর্ণভাবে আমাদের ঈমান, আকিদার পরিপন্থী। আমাদের কালচারের পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক। যার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস নীতি-নৈতিকতা ধ্বংস করে অশ্লীল বেহায়াপনা, এমনকি অপরাধপ্রবণতাকে উস্কে দেয়া হচ্ছে। এটাই

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। শ্লো পয়জনের মতো স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের রক্তের সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে, যা হিরোসিমার অ্যাটোম বোমার চেয়েও মারাত্মক। আমাদের কচি ছেলেমেয়েরা এখন বাংলার চেয়ে হিন্দি গান পছন্দ করে, নায়ক-নায়িকাদের পোশাক, চলাফেরা, এমনকি চুলকাটা পর্যন্তও অনুকরণ করে। মাথায় সিঁদুর পরা, ধুতি স্টাইলে সালোয়ার পরা, পার্বতী শাড়ি এবং পার্বতী স্টাইলে পরা, মন-মগজে ঐগুলো ঢুকে যাচ্ছে।

ইসলামি সংস্কৃতি

ইসলামি মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই ইসলামি সংস্কৃতি। আল্লাহর কালাম আল কুরআনের মতাদর্শের বিস্তারিত রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং নবী করিম (সা:)-এর মহান জীবন ও শিক্ষার পুরোপুরি প্রতিফলন। বস্তুত মনের স্বস্তি-প্রশান্তি-স্থিতি ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাই ইসলামি সংস্কৃতি। আল্লাহ, রাসূলও পরকালের প্রতি অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং তদ অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি, তার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যম। ইসলামি সংস্কৃতি মানুষকে মূর্খতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয়, ভীরু কমজোর, কাপুরুষকে সাহসী করে তোলে। তাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে আল্লাহভীতি, পরকালের জবাবদিহি এবং জীবনের প্রতিপদে প্রতিক্ষেত্রে রাসূল (সা:)-এর অনুসরণের সুদৃঢ় ভাবধারা।

মহান আল্লাহ নিরক্ষর লোকদের ভেতর তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন। সে রাসূল তাদের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন ও বাণীসমূহ তুলে ধরবে, তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং তাদের কিতাব ও পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি শিক্ষা দেবে।' (সূরা : জুম'আ : ২) কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, 'হিকমত' শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র বা নৈতিকতা।

ইসলামে চরিত্রের গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা নিম্নোদ্ধৃত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।

'আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অতি উত্তম আদর্শ রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

সময়ের সাথে নয় সময়কে অতিক্রম করে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পেরেছিল বলেই ইসলাম কালজয়ী আদর্শ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ

www.pathagar.com

করেছে। ইসলাম এক নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে যা সমগ্র মানবজাতির জন্য বিস্ময়কর আশীর্বাদ। আর তা কেবল সম্ভব হয়েছিল মানবতাপূর্ণ সংস্কৃতির পথ ধরেই। ইসলাম শুধু ধর্মই নয় সার্বিক জীবন বিধান। জীবনাচার পদ্ধতি। তাই ইসলাম শুধু তৌহিদবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি। ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মুক্তির পথ সকল ক্ষেত্রেই অবদান বিস্তৃত করেছে। মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সংগীত, শিল্পকলা স্থাপত্যে অ-সামান্য অবদান রেখেছে যার ফলেই শিল্পের অন্ধকার যুগ অতিক্রম হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ এসেছে।

একদিন ইসলামি সংস্কৃতি সারাবিশ্বের সমগ্র মানুষকে প্রভাবিত করেছিল- সেই সংস্কৃতির ধারকদের পরবর্তী প্রজন্ম আজ শিখরচ্যুতি নিঃস্ব, একদিন যারা পথহারাদের পথ দেখিয়েছিল আজ সেই মুসলমানই পথ হারিয়ে অন্ধকারে পথ হারাচ্ছে। সভ্যতার জন্যে গর্বিত স্পেন সাত'শ বছর বিশ্বের অনুকরণী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন করে কেনো নিশ্চিহ্ন হলো। তার কারণ অনুসন্ধান ও দিক নির্দেশনের চেষ্টা বর্তমান মুসলমানদের নেই।

আজ মুসলমানরা সংস্কৃতিক জগতে দিশেহারা পথিক। ইসলামি সংস্কৃতি কী? কেমন? কিছুই জানা নেই। ভিন্ন সংস্কৃতির গোলামিতে আচ্ছন্ন হয়ে তাকে নিজস্ব সংস্কৃতি মনে করছে।

তাওহিদবাদী ১৬ কোটি মুসলমানদের দেশে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে শুভকাজ উদ্বোধনের প্রথা চালু হয়েছে। যাদুটোনার বিশ্বাসী নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রেতাত্মার প্রভাব দূরীকরণে প্রচেষ্টা অনুকরণে মুসলমান ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন পশু-পাখির মুখোশ পরে সং সাজার রেওয়াজ চালু করেছে। তরুণসমাজ সামাজিক অপরাধের শিকার। মুসলমানদের সামাজিক সূত্র থেকে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে যুবকরা। আজ রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। তাদের হাতে আজ পিস্তল, বোমা, বারুদ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির আখড়া, হাতে বই এর পরিবর্তে ফেনসিডিলের বোতল, পড়ার পরিবর্তে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। ছেলের হাতে মা, বাবার হাতে ছেলে খুন হচ্ছে অহরহ। এইগুলো অবক্ষয় অসুস্থ সমাজের পরিণতি দিন দিন বেড়ে চলছে, শিক্ষিত চোর-ডাকাত নিষিদ্ধ পল্লী উঠে এসেছে সম্ভ্রান্ত এলাকায়, মেধা পাচার হচ্ছে বিদেশে। এ সবকিছুই সংস্কৃতির অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ। আজ সারা বাংলাদেশে সাংস্কৃতি ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। রাজনীতিতে গডফাদার সংস্কৃতির পর এবার গুম সংস্কৃতি, অপহরণ, ধর্ষণ, বাড়িঘর ভাংচুর, দখল, শিশু ধর্ষণ, কাস্টাডিতে, নারী ধর্ষণ, পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্তৃক

www.pathagar.com

ছাত্রী ধর্ষণ, এমনকি শত ছাত্রী ধর্ষণের উৎসবও পালন করা হচ্ছে। এসিড নিক্ষেপ ছিনতাই, চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি, হিংসা, বিদ্বেষে। এইসব ঘটনার দেশকে নরককুণ্ডে পরিণত করেছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে দেশের ভিতরেই বেড়ে চলছে ক্রীতদাসের সংখ্যা, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী যারা জাতিকে পথ দেখাবে তারাই আজ বিদেশী স্কলারশিপ, পদক, খেতাব, পুরস্কার, এমনকি নগদ মাসোয়ারা অর্থপ্রাপ্তির লোভে আত্ম বিক্রি করে বিদেশী দালালশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের ভিতরে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে নিজের মেধা নিংড়ে দিচ্ছে।

১৯৪৭-এর পর থেকেই কিছু সংখ্যক দেশের বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এদের মগজ ধোলাই করে এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে জনমনে সু-পরিকল্পতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াতে সক্ষম হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, একই দেশের মুসলমানদের হাজার হাজার বছরের গৌরবজনক সমৃদ্ধশালী সোনালি যুগের ইতিহাস বিকৃত করে আমাদের নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস শেখানো হচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনেই আজ গোটা জাতি অবসাদগ্রস্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন, তাদের তেজস্বী জীবনী শক্তি নিস্তেজ হয়ে গেছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যুদ্ধে শত শত মিযাইল আমাদের বংশধরদের ইসলামি চেতনা বিশ্বাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে।

কবি-সাহিত্যিক শিল্পী, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক সবাইকে মোহগ্রস্ত করে তাদেরকে জাতীয় বেঈমানের কাতারে দাঁড় করিয়েছে।

আজ পৃথিবী থেকে সমাজতন্ত্র তথা বস্তুবাদ চিরতরে ইতিহাসের আস্তকুড়ে নিক্ষিপ্ত। জনতাই মার্কস লেনিন-স্ট্যালিনের মূর্তি, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। তখন ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে ভারত বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা এমনকি মুসলমানদেরকে আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলছে।

আর আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষবাদিরা আমাদের সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ শুধু তুলে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নাম থেকে ইসলাম মুসলিম শব্দগুলোও বাদ দিয়েছে। ইসলামের পারিবারিক আইনের উপর হাত দিয়েছে। এরা আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি, কালচার, ধর্মীয় মূল্যবোধ সব কিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ধর্ম মানুষকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। মানুষকে তার বিভিন্ন দোষত্রুটি মুক্ত করতে সহায়তা করে। অর্থাৎ আল্লাহর হক এবং বান্দার হক আদায় করার নামই

www.pathagar.com

ধর্ম। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন- ধর্ম লোক সম্পর্কে ধারক বা রক্ষা করে এই জন্যই ধর্ম বলে-যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয় উহাই ধর্ম।

মানুষর চাহিদা অসীম। তার এই চাহিদা পশুবৃত্তি ষড়-রিপুর বশ করতে চাই ধর্মীয় চেতনা। অধ্যাত্মিক শিক্ষায় আত্মিক উন্নতির শিক্ষা, ধর্মই শিক্ষকের অল্পে তুষ্টি এবং ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শোকর-গুজার, কৃতজ্ঞতা ও কোমলতা।

সহানুভূতি চারিত্রিক পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা, বদান্যতা, সাহসিকতা, বীরত্ব আত্মমর্যাদাবোধ পুণ্যতা, সত্যবাদিতা, যাবতীয় সৎ গুণাবলী। ধর্মই মানুষকে মহত্ত্বের সুন্দর সুশৃঙ্খল জীবন গড়ার পথ দেখায়। ইসলাম মানুষকে উপভোগ করতে বলে। কিন্তু ভোগবাদী হতে নিষেধ করে।

আজ মানুষের চাহিদা অসীম, তারা নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ভোগবাদের পাঁকে পড়ে বেপরোয়া, ভোগবাদী, উচ্ছৃঙ্খল, আরও চাই মানসিকতা, মানবতা দূরে ঠেলে, শেকড়হীন পরগাছার, ঘুষ, দুর্নীতি, খুন, গুম ইত্যাদি করে সামাজিক অবস্থাকে আতংকিত করে তুলছে।

পৃথিবীতে অনেক জাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের ধর্ম, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান জীবন দর্শন আবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের সাংস্কৃতিক ধারা ধর্মীয় বিশ্বাস এর প্রতিফলন প্রকাশই সংস্কৃতি। পৃথিবীতে যত জাতিগোষ্ঠী তত সাংস্কৃতিক প্রাধান্য। বাংলাদেশ ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ। সুতরাং তাওহিদ একাত্মবাদের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে ইসলামি সংস্কৃতি।

ইসলামি সংস্কৃতির মূল উৎস হলো আল কোরআন যা লিপিবদ্ধ আল্লাহর বাণী বা মানুষের জীবনপদ্ধতি। যার বাস্তব রূপ, হযরত মুহাম্মদ (সা:) অর্থাৎ জীবন্ত কোরআন।

মুসলমানদের কালচার নিছক আনন্দ ফুর্তির জন্য নয়। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের পথ।

প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে এই জীবন শেষ নয়, মৃত্যুর পর আরেক জীবন আছে। যার শুরু আছে, শেষ নেই। অনন্ত জীবন আর পৃথিবীটা হলো খুবই স্বল্প সময়ের জন্য। এখানে যে ভালো কাজ করবে সে পরকালে অনন্ত জীবনে অফুরান আরাম-আয়েসে থাকবে। আর মন্দ কাজ করলে অসীম সময়ের কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। এই বিশ্বাস থেকে মুসলমানদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা কোরআন ও হাদিসের নির্দেশিত পথ।

www.pathagar.com

কাজেই ইসলামি সংস্কৃতি পৃথিবীর শুধু মানুষেই নয়, সমস্ত প্রাণীর জন্যেও কল্যাণকর, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন।

আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান। সমগ্র সৃষ্টি জগতে কে কী করছেন সব কিছুই আল্লাহ দৃষ্টিসীমার মধ্যেই।

আল্লাহর দৃষ্টির অগোচর বলতে কিছু নেই। তাই একজন মুসলমান কখনো জ্ঞাতসারে খারাপ কাজ করতে পারেন না। সে বিশ্বাস করে আমি যা করছি এবং অন্তর দিয়েই যা চিন্তা করছি সবই আল্লাহ অবগত। সুতরাং একজন আস্তিক বিশ্বাসী কখনো খারাপ হতে পারে না, আবার নাস্তিক ভালো হতে পারে না, কারণ তার মধ্যে পরকালীন ভয় নেই।

অবতারবাদী হিন্দু জীবনদর্শন নিয়ে গড়ে উঠেছে হিন্দু সংস্কৃতি। যেখানে লিঙ্গপূজা, যোনিপূজাকে পবিত্র মনে করা হয়। মন্দিরে পুরোহিত ব্রাহ্মণদের উপভোগের সামগ্রী যুবতী নারীদের দেবদাসী হওয়াকে পুণ্যাত্ম জ্ঞান করা হয়। ভারতের সুনাম খ্যাত ভরতনাট্যম এর নৃত্যশিল্পী রুক্মিনী দেবী ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির সাথে ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ভরতনাট্যম নৃত্য আসলে ধর্মীয় বারবনীতার দেবদাসীদের পূজারী মনোরঞ্জনের ছল-কলা। নরনারীর উলঙ্গস্থানকে পুণ্যের কাজ মনে করা হত। এই সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য প্রকট, জীবনবোধের এবং মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণেই উপমহাদেশের মুসলমানদের আলাদা আবাসভূমি করা হয়েছিল।

কিন্তু আজ দুঃখজনক হলো আমাদের দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক কর্মী যারা নিয়মিত মাসোয়ারার বিনিময়ে তারা সীমান্ত মুছে ফেলতে চান। তারা দুই বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পান না।

পবিত্র কোরআনে যিনা ব্যভিচারকে হারাম করা হয়েছে। শক্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ বা উৎসাহ দিতে পারে এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত পোশাক পরা। নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা, নিভৃতে নারী-পুরুষের সাক্ষাৎ। অশ্লীল সাহিত্য পত্র-পত্রিকা, নগ্ন ছবি, অশ্লীল গান শোনা, উত্তেজনাকর মিউজিক শোনা। যে গুলো ব্যভিচারকে উস্কে দিতে পারে– এগুলোকে ইসলাম এবং ইসলামি সংস্কৃতি নিষিদ্ধ করেছে, দূরে থাকতে বলেছে।

www.pathagar.com

কিন্তু আজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসন। বসন্ত বরণ, ভালোবাসা দিবস, থার্টিফার্স্ট নাইটের রেওয়াজ চালু করে যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী যে ধরনের খোলামেলা পোশাকে ঢলাঢলি আচরণ করে, ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে ঐ রাতে যেসব পান উন্মুক্ত নরনারীর ব্যালে ড্যান্স কর্মকা- বা কালচার চালু হয়েছে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে তা আমাদের সংস্কৃতি নয়, অপসংস্কৃতির আগ্রাসন।

একটি কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের মানুষের ইসলামি চেতনাই বাংলাদেশকে ভারতের গ্রাস থেকে আলাদা রাখতে পারে। সাংস্কৃতিক চেতনা তাহজিব তমদ্দুন যত দৃঢ় হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা তত শক্তিশালী হবে।

ইসলামি চেতনা কালচার যত দুর্বল হবে স্বাধীনতার অস্তিত্বও তত হুমকির সম্মুখীন হবে। একাত্মবাদী কৃষ্টি কালচারকে মুছে ফেলতেই টিভি চ্যানেল থেকে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের আক্রান্ত করছে আমাদের পরিবার, ধর্মীয় মূল্যবোধ সব ধ্বংস করে দিচ্ছে। পরিবারের সবাই প্রতিদিন সকালে ফজরের নামাজের পর কোরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস এখন আর দেখা যায় না। ভারতীয় টিভি-চ্যানেল দেখে ঘুমিয়ে পড়ে আবার ঘুম থেকে উঠে সেই হিন্দি। আমাদের চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে বিখ্যাত অভিনেতা আরিফুল হকের ভাষায় "২৫টি সেক্টর থেকে আমাদেরকে মিসাইলের মতো আঘাত করে ধক্ষংস করে দিচ্ছে।" আমাদের দেশের যুব সমাজ শুধু নয়, আমাদের পরিবারের মধ্যেই প্রতিপক্ষ দাঁড় করাচ্ছে।

হিন্দু-মুসলমান কালচার কোনোকালেই এক ছিল না। প্রাচ্যের পণ্ডিত ভূতাত্ত্বিক আলবেরুনি এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম কালচারের প্রভেদের কথা বলে গেছেন। ১৯৩৫ সালে জওহেরলাল নেহরুর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, হিন্দু-মুসলমান পাত্রের ক্ষেত্রেও দুই ধরনের পাত্র ব্যবহার করে। ৪০ দশকের তার লেখা "ডিসকবারি অব ইন্ডিয়া" বইতে ভারতীয় কালচার বলতে পাক ইসলামি যুগের কালচারকে বুঝিয়েছেন। নেহেরু আরও লিখেছেন, মুসলমানের ঐক্যের কারণ তাদের কালচার সম্পর্কে গর্ববোধ, তারা মনে কারণ ইসলামি কালচারেই তাদের নিজস্ব।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ১৯৩৯ সালে লিখিত 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষ প্রবন্ধে লিখেছেন– "বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস" পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে।

www.pathagar.com

মুসলমানরা এদেশে শুধু রাজনৈতিক বিজয়ই অর্জন করেছিলেন না, রাজনৈতিক বিজয়ের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক বিজয়ও অর্জন করেছিলেন। মুসলমান কোনো দেশ বিজয়ের সাথে সাথে সেখানে মসজিদ মিনার তৈরি করে, আর সেই মিনারে মুয়াজ্জিন উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করে। নামাজের জন্যে কল্যাণের জন্যে ডাক দেয়। এভাবেই উপমহাদেশে এখানকার নির্যাতিত হিন্দুরা এই ইসলামি কালচারকে ধারণ করেছিল। এই কালচার ছিল উচ্চু-নীচ সমস্ত জাতিভেদ ভুলে এককাতারে দাঁড়ানোর সংস্কৃতি, যে নিম্নবর্ণ ছুঁইয়ে দিলে জাত যেত। দেখা গেল এই সুদর্শন এরাবিয়ান মানুষগুলোর সাথে একসাথে এক পাতে খাচ্ছে তাতেই তাদের জাত যাচ্ছে না, সেবা মানুষের ধর্ম, বিপদে একজনের পাশে দাঁড়ানো। অপরাধীদের ক্ষমা করা মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা এগুলো ছিল তাদের কল্পনাতীত। সামাজিক নৈতিকতা বলতেও কিছু ছিল না। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তার "দি হিস্টরি অব বেঙ্গল" বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন "এদেশে মুসলিম আসার আগে কালচার বলতে কিছু ছিল না। তারা সাপ, ব্যাঙ, গাছ, পাথর ইত্যাদির পূজা করতো। ঐতিহাসিক ড. এম এ রহীম তাঁর 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে' শীর্ষক গ্রন্থে ১ম খণ্ডে লিখেছেন "দুর্গাপূজা, হোলি ইত্যাদি উপলক্ষে ছেলে মেয়েদের মধ্যে যৌনাচার ও কদর্যতা চলত। তারা সেলাই করা পোশাকের ব্যবহার জানতো না। নারী-পুরুষ দুখণ্ড বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতো।"

এই দেশের মানুষ মশলার ব্যবহার জানতো না, সু-স্বাদু আহার প্রস্তুত প্রণালী জানতো না। পর্যটক র‍্যালফ ফিচ বর্ণনা করেছেন, "তারা মাছ খায় না পশু হত্যা করে না। ভাত-দুধ ও ফলমুল আহার করে জীবন ধারণ করে। আজকের কোর্মা, পোলাও, বিরিয়ানী, কোপ্তা-কালিয়া, কাবাব, পরটা, আচার, মুগলাই এগুলো মুসলমানদেরই অবদান।

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অমর্ত্য সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে বলেছে "ভারতবর্ষে মুসলমানদের আটশত বছরের গৌরবময় কালচার, সমৃদ্ধ করার ইতিহাস তাদের কৃষ্টি কালচারকে কোনভাবেই অস্বীকার বা মুছে ফেলা যাবে না।"

* ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের লেখা থেকে জানা যায় আর্য সমাজে একজন নারী একসাথে চার পাঁচজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলাই ছিল সামজের রীতি। কোনো নারী যদি তাতে আপত্তি জানাতো তাকে সামাজিক শাস্তি ভোগ করতে হতো। ড. অতুল সুর 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' নামক বইতে

www.pathagar.com

উল্লেখ করেছেন হিন্দু সমাজে বহু-পত্নী গ্রহণের সাথে সাথে বহু পতি গ্রহণের প্রথাও চালু ছিল ছিল। যেমন মহাভারতের দ্রোপিদীর পঞ্চ স্বামীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইবনে খালদুন আরও লিখেছেন, যদি কোনো স্ত্রীর তার স্বামীর ঔরসে সন্তান না জন্মাতো, তাহলে অন্য পুরুষের সঙ্গ নিয়ে সন্তান ধারণ করা দোষের ছিল না। বরং তা ধর্মীয় বিধান রূপে গণ্য হতো। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র পান্ডর দুই স্ত্রী ছিল কুন্তী দেবী ও মাদ্রী। পাণ্ডু সন্তান জন্মদানে অক্ষম ছিলেন বিধায় আপন স্ত্রী কুন্তী দেবীকে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের সাথে সঙ্গদানের অনুমতি দিয়ে লাভ করলেন যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জুন, নামক তিন পুত্র এবং আপন স্ত্রী মাদ্রীর সাথে আশ্বিনী কুমারদ্বয়ের সঙ্গমে জন্ম নেয় নকুল ও মহাদেব। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্যভিচারকে ধর্মীয় স্বীকৃতি এবং অনুমোদন দেয়া হয়েছিল।

কালীপূজায় নরবলি দিত, সতীদাহের নামে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা হতো। মুসলমানরা এদের কুসংস্কারমুক্ত করে আলোর পথ দেখায়, বেদাত উচ্ছেদ করে। কাগজে লেখা শিখিয়েছে, শিখিয়েছে ইতিহাস লেখার কৌশল। স্থাপত্য বলতে ছিল দো-চালা, চার-চালা ঘর। মুসলমানদের শিখানো আর্চ, খিলান, গম্বুজ পদ্ধতি, মন্দিরে টেরাকুটার কাজ করাতে মুসলমান শিল্পীদেরকেও নিয়োগ দেয়া হতো। চিত্রশিল্পে মুসলমানরা নতুন মাত্রা যোগ করে নতুন যুগের সূচনা করলো, সাহিত্যে মননশীল মানবীয় উপাদান, পোশাকে মার্জিত রুচির সংযোগ করে সমৃদ্ধ করলেন।

জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নানার উপকরণ– জগ, পর্দা, ফোয়ারা, কেবিন, জর্দ্দা, হাউজ, টেবিল ক্লথ, ডিস, কার্পেট, ইত্যাদি এই সব অসংখ্য জিনিসের উদ্ভব ঘটিয়েছেন মুসলমানরাই। আদব কায়দা ও সঙ্গীত শাস্ত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। আজ মুসলমানদের কাছ থেকেই সংস্কৃতি ধিক্কার পাচ্ছে।

ভাষায় আগ্রাসন

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে জাতিসত্তা লোপ পায়। মুছে দেয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে, ধ্বংস করে। ভাষায়ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো হচ্ছে অত্যন্ত সু-পরিকল্পিতভাবে; আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষার নির্মাতা মুসলমানরাই। মুসলমান শাসক, বিশেষ করে সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা বেশি সমৃদ্ধ হয়।

www.pathagar.com

মুসলমানরা আটশত বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। তখন থেকে আরবি-ফার্সি ভাষার প্রচুর শব্দ মিশ্রিত হয়ে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়। এ সম্পর্কে হ্যালহেড বলেন, "সে সময় আরবি-ফার্সি মিশ্রিত বাংলাভাষাই ছিল উৎকৃষ্ট খান্দানি ভাষা" সে সময় বাংলা ভাষার সারা গায়ে মুসলিম সংস্কৃতির ছাপ লেগেছিল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের জনগণের শতকরা ষাটটির মতো শব্দ ছিল আরবি-ফার্সি শব্দ। হ্যালহেড এর ভাষায় "শুদ্ধ ও খান্দানি লোকদের ভাষাকে বাদ দিয়ে বাংলা গদ্যের রূপায়ণ ঐতিহ্য বিরোধী এবং ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করেছিল। এই প্রয়াস সমসাময়িক মুসলিমবিদ্বেষী রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই।

বিখ্যাত অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিল্পী আরিফুল হক 'সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ' বই এ লিখেছেন, পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের হাতে পরাজয়ের পর মুসলমানরা ইংরেজদের শত্রু ও হিন্দুদের মিত্রে রূপান্তরিত হয়। পাদ্রি উইলিয়াম কেরি, ফরেস্টার প্রমুখের পরামর্শে বাংলা ভাষাকে যবন প্রভাবমুক্ত করতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয়,তর্কালংকার রাম রাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুন্সী সাংস্কৃতিক পন্ডিতগণ বাংলা ভাষা থেকে আরবি-ফার্সি শব্দ উৎখাত শুরু করেন। তারা অপ্রচলিত সংস্কৃতিক প্রতিশব্দ সৃষ্টি করে ইংরেজদের অভিধান রচনায় সহায়তা করে। নিজেরাই আরবি-ফার্সি শব্দ বর্জন করে লিখতে থাকেন।"

এ বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "যদি পলাশীর ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরও তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী আজ বাংলাভাষা থেকে আরবি-ফার্সি ইসলামি শব্দ মুছে ফেলার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জ্ঞান ভাণ্ডার, জ্ঞানের উৎস আল কোরআন জীবনীশক্তি চেতনা মুক্তি হিসেবে মনে করছে না। পাঠ্যবইগুলোতেও ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস, সোনালি যুগ, নীতি নৈতিকতার আদর্শ ইসলামি তাহজিব-তমুদ্দুন, প্রেরণাশক্তির ইতিহাস বীরত্ব-মহত্ত্ব এগুলো বর্জন করা হচ্ছে। সেক্যুলার ইজমের নামে ধর্মীয় বিষয় বিশেষ করে ইসলামি কালচারকে মুছে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বাংলা ভাষায় সাংস্কৃতিক ছোবল, বিষয়ে খ্যাতিমান কলামিস্ট রম্যলেখক মরহুম সালাহ উদ্দিন জহুরী অনেকগুলো লেখা লিখেছেন। আরিফুল হকও পত্রিকায় আংগুল দিয়ে দেখিয়েছেন আমাদেরকে, যার কিছু উল্লেখ করা হলো-

www.pathagar.com

খবর পরিবর্তে সংবাদ, খাওয়ার পরিবর্তে আহার। বসার পরিবর্তে উপবেশন, গোসলের পরিবর্তে স্নান, খুনের পরিবর্তে রক্ত, হুবহু বাদ দিয়ে অবিকল। সামিল বাদ দিয়ে অন্তর্ভুক্ত, কবর বাদ দিয়ে সমাধি, জিন্দাবাদের পরিবর্তে দীর্ঘজীবী, ইস্তফা বাদ দিয়ে পদত্যাগ, ওয়াদা বাদ দিয়ে প্রতিশ্রুতি, দরকার বাদ দিয়ে আবশ্যক, দারওয়ানের পরিবর্তে প্রহরী, লাশের পরিবর্তে শবদেহ, গুনাহ-এর পরিবর্তে পাপ, চাকরের বদলে ভৃত্য, জানোয়ারের পরিবর্তে পশু, দাওয়াতের পরিবর্তে নিমন্ত্রণ, পা-এর বদলে চরণ, বরখাস্তের বদলে কর্মচ্যুত। চ্যান্সেলর হয়েছেন দেবপূজক পুরোহিতের আবার আচার্য, আইনসভা হয়েছে বিধানসভা, সংসদ সদস্যকে সাংসদ, পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার দেশ সাংস্কৃতিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করছে। দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকার ভাষা যদি আমাদের আদর্শ হয়! কাজেই আমাদের এখনই সতর্ক হতে হবে, লেনিন-স্ট্যালিনের সহকর্মী বিশ্ব ব্যক্তিত্ব বিখ্যাত মানবেন্দ্রনাথ রায় (এমএন রায়) "The Historical role of Islam" বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন, মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার অধিনায়ক হয়ে রইলো, এমনকি আজও তার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা অতীত ঋণের এই বোঝা স্বীকার করতে চান না। দুর্ভাগ্য আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামে সংস্কৃতি সম্পদ থেকে ভারত তেমন উপকৃত হতে পারেনি, কেননা অনুরূপ সম্মানের অধিকার হওয়ার যোগ্যতা তার ছিল না।

এখন এই বিলম্বিত রেনেসাঁর সৃষ্টি বেদনা মানবেতিহাসে অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতবাসীরা প্রভূত লাভবান হতে পারে। এ কথাটা একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট বুঝলেও আমরা বাংলাদেশের ১৪ কোটি মুসলমান বুঝলাম না।

www.pathagar.com

সভ্যতা

সংস্কৃতির চরম উন্নতিই হচ্ছে সভ্যতা, সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে দেহ। একটি জাতির উন্নতি তখনি সম্ভব যখন তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়। সভ্যতা হলো এমন একটা সামষ্টিক জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে সাংস্কৃতিক সুফলগুলো আহরণে সর্বাধিক সাহায্য করে। অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ ও কার্যপন্থা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো, নৈতিক রীতিনীতি ও বিধিসমূহ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্যের স্থিতিশীলতা।

পৃথিবীর মানব বসতি শুরু হওয়ার পর থেকেই সভ্যতার ইতিহাস শুরু হয়েছে। প্রতিটি সভ্যতাই পরবর্তী সভ্যতার উপাদান-উপকরণ সরবরাহ করে সভ্যতার ধারাবাহিকতার পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ নিশ্চিত করে। এভাবেই প্রত্যেক জাতি তার পরবর্তী জাতির কাছে সভ্যতার উপাদান হস্তান্তর করে এসেছে। ও ক্রমাগত চলছে।

সভ্যতা কোনো বিশেষ প্রজন্মে বা ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি সভ্যতাকে অপর সভ্যতার ওপর বিশিষ্টতা দান করে, তা হচ্ছে ঐ সভ্যতার ভিত্তি কতটা মজবুত এবং মানবজাতি কতটা উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

যে সভ্যতার লক্ষ্য ও আবেদন বেশি উদার, বিশ্বজোড়া এবং তা যত বেশি মানবদরদী, আচার-আচরণ যতবেশি নৈতিক গুণে মণ্ডিত। সেই সভ্যতাই ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী এবং অমরত্ব লাভ করেছে।

'মানুষের বস্তুনিষ্ঠ বৈষয়িক প্রয়োজনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তার সহায়তা করে। আর ধর্মবিশ্বাস, শিল্পকলা, সৌন্দর্যবোধ ও দর্শন নিবৃত্ত করে তার আত্মার পিপাসা। অন্য কথায় ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম ও সুকোমল

www.pathagar.com

আবেগ-অনুভূতি এবং হৃদয় ও আত্মার দাবি ও প্রবণতা পূর্ণ করে যেসব উপায়-উপকরণ তা-ই হচ্ছে শিল্প।

সঙ্গীত, কবিতা, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তা এক একটা জাতির সংস্কৃতি প্রকাশের মাধ্যম, দর্পণ। শিল্প হলো সংস্কৃতির বাহন। কোনো বাহ্যিক ও বৈষয়িক উদ্দেশ্য লাভের আত্মিক চাহিদা পূরণই আসল লক্ষ্য এবং এই সব সৃজনশীল কাজেই অর্জিত হয় মন ও হৃদয়ের সুখানুভূতি।

কাব্য, সুর, চিত্রশিল্প, হৃদয়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। এই মাধ্যমে আত্মা, সুখ, আনন্দ, দুঃখ ও তৃপ্তি লাভ করে। এইসব মূল্যবান, মূল্যবোধ, হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখেই সংস্কৃতির রূপায়ণ হয়।

বস্তুনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজনে সাবলীলতা বিধানে যা কিছু সাহায্যকারী তাই সভ্যতা। কিন্তু মন-মানস ও আত্মার কামনা-বাসনা ও সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতির চরিতার্থতার উপায়-উপকরণই সংস্কৃতি।

সভ্যতার ক্রমবিকাশমান, প্রতি মুহূর্তে উন্নয়নশীল। প্রাচীন মতাদর্শের সাথে তার দূরত্ব ক্রমবর্ধমান। নিত্য-নতুন দিগন্ত সন্ধানী। কিন্তু সংস্কৃতি প্রাচীনপন্থী। প্রাচীন দৃষ্টিকোণ ও মতাদর্শ থেকে নিঃসম্পর্ক হওয়া তার পক্ষে কঠিন।

সভ্যতা দেশের সীমা বন্ধনমুক্ত বিশ্বজনীন ভাবধারা সম্পন্ন, প্রায় চিন্তা-বিশ্বাসের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু সংস্কৃতির ওপর পরিবেশ ও ভৌগোলিক বিশেষত্বের প্রভাব প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতি আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুলাংশে বন্দী। কেবল সমমতের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক মেজাজ-প্রকৃতির ওপর তাদের বিশেষ ধর্মের সর্বাত্মক প্রভাব বিরাজিত, সেই সঙ্গে উপমহাদেশের মুসলমানরা একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর। সভ্যতা স্থিতিশীল ও দৃষ্টতাপ্রবণ। তার প্রভাব সহজে নিশ্চিহ্ন হবার নয় কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, প্রতি মুহূর্তেই অস্থায়িত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরতার ঝুঁকির সম্মুখীন।

www.pathagar.com

সভ্যতা মানুষের বাইরের জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুগত প্রয়োজনাবলীই তার কর্মক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উদ্ভাবনী ও বিভিন্ন শৈল্পিক দুর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানটি এক দেশ ও জাতি থেকে ভিন্ন দেশে চলে যেতে পারে। অনুন্নত জাতিগুলোও তা থেকে উপকৃত হতে পারে, স্বভাব-প্রকৃতিগত পার্থক্যতার পথ বাধা হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

কিন্তু সংস্কৃতি সাধারণত এক বংশ থেকে তারই অধঃস্তন বংশে উত্তরিত হয়। সাম্যকভাবে অর্জিত হয় না। বাছাই প্রক্রিয়া এখানে পুরোপুরি কার্যকর। কেবলমাত্র বিশেষ পরিমণ্ডলের লোকদেরই কল্যাণ লাভ সম্ভব। দার্শনিক সুলভ চিন্তা, গবেষণা ও কবিসুলভ উচ্চ মার্গতার অনুভূতি যার– তার পক্ষে অসত্যযোগ্য নয়।

সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ জীবনকেন্দ্রিক। অন্তর্নিহিত জীবনেই সংস্কৃতি, জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের মাধ্যম হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হচ্ছে মন-মগজ কেন্দ্রিক আবর্তন-বিবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত বহিঃপ্রকাশ। মোট কথা আমরা যা ভাবি, চিন্তা করি, বিশ্বাস করি তার দৃশ্যমান প্রতিফলন সংস্কৃতি। হৃদয়ানুভূতি, চিত্তবৃত্তি, আবেগ উচ্ছ্বাস ও মানসিক ঝোঁক প্রবণতার সাথে এর সম্পর্ক।

পৃথিবীর মানবজাতির অভ্যুদয়ের পর যতগুলো সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে, ইসলামি সভ্যতাই তার মধ্যে অন্যতম। এ বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকরা একমত পোষণ করেছেন। ইসলাম শুধু ধর্মই নয়, এক অসাধারণ সভ্যতার জন্ম দিয়েছে যা বিস্ময়কর। এর আগে অনেক সভ্যতা ছিল এবং পরেও অনেক সভ্যতার জন্ম ঘটেছে আবার ধ্বংসও হয়েছে।

সভ্যতার অধঃপতন ও ধ্বংসের জন্যে কিছু উপকরণ রয়েছে। এগুলো হলো- নৈতিক ও চিন্তাগত উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্য, আইন-শৃঙ্খলার বিপর্যয়, জুলুম, নিপীড়ন, শোষণ ও দারিদ্র্যের ব্যাপকতা, দুস্থ মানুষের বিস্তৃতি, দুস্থদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, সার্থকতা ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যোগ্যতা আন্তরিকতা সম্পন্ন নেতার অভাব।

www.pathagar.com

গিসবার্ট (Gis bert) সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য প্রভেদ নিরূপণ করেছেন :

১. দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাপ নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, হাতে বুনা তাঁতের তুলনায় যান্ত্রিক তাঁতের ক্ষমতা অনেক বেশি। আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে মতভেদের কারণে কোনো ভালো চিত্র কারো দৃষ্টিতে সুন্দর, কারোর চোখে অসুন্দর, নিন্দনীয়।

২. সভ্যতার অবদানগুলোকে সহজে বুঝা যায়- উপলব্ধি করা যায়। সাধারণ লোক সামান্য শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতি কলা-কৌশল ও ব্যবহার পদ্ধতি বুঝে নিতে পারে। কিন্তু কোনো কবি কবিতা বা শিল্পী ছবি আঁকা ভালোভাবে শেখালেই যে ঐ বিষয় যে সে দক্ষতা অর্জন করবে তা নিশ্চিত বলা যায় না।

৩. সভ্যতার গতি যেমন দ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়। সংস্কৃতির গতি অনেক বাধাপ্রাপ্ত হয়। কখনো বা সংস্কৃতি হয় পশ্চাত্যগামী। অনেক সময় আধুনিকতম সভ্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। বস্তুত ব্যক্তির সুস্থতা সঠিক লালন ও বর্ধন লাভের জন্যে যেমন দেহ ও প্রাণের পারস্পরিক উন্নতিশীল হওয়া জরুরি, ঠিক তেমনি একটি জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুরোপুরি সংরক্ষণ একান্তই জরুরি সে জাতির সঠিক উন্নতির জন্য। বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাণ বা জীবন আর সভ্যতা হচ্ছে দেহতুল্য।

মানব জীবনের দু'টি দিক, একটি বস্তুগত আর দ্বিতীয়টি আত্মিক : এই দুটির নিজের চাহিদা রয়েছে। মানুষ এই দুটি দাবি-দাওয়া পূরণে সর্বদা মশগুল থাকে কোথায়ও আর্থিক ও দৈহিক প্রয়োজন তাকে নিরন্তর টানছে। তাই জীবিকার সন্ধানে নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও রয়েছে আত্মিক দাবিতে আকুল আবেদন। মানুষ বস্তুগত ও জৈবিক প্রয়োজনে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার কাজ করছে আর ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন তার মনের ক্ষুধা মিটায়। যে সব উপায়-উপকরণ একটি জাতির ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগময় ভাবধারা এবং মন ও আত্মার দাবি পূরণ করে, তাই হচ্ছে সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

নৃত্য, সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্যচর্চা, ধর্মীয় আক্বিদা বিশ্বাস এবং দার্শনিক চিন্তা গড়ে ওঠা একটি জাতির সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশের মাধ্যম। মানুষ তার অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে এসব কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। এইগুলো থেকে তৃপ্তি আনন্দে-প্রফুল্লতা লাভ করে।

পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে না। অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। তাকে নির্মূল করতে চায়। আর ইসলামি আদর্শবাদীদের কাছে এ কারণে ইসলামি সংস্কৃতির প্রশ্ন অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

ইসলামি সভ্যতা

ইসলামি সভ্যতা আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসই তার ভিত্তি। বিশ্বের ইতিহাসে ইসলামি সভ্যতাই সর্বপ্রথম সভ্যতা যে মানুষকে এক আল্লাহর পথে আহক্ষান করে এবং ঘোষণা দেয় যে তাঁর রাজত্ব ও সামনে আর কারো অংশীদারিত্ব নেই। ইবাদত শুধু তাঁরই করতে হবে। এবং তাঁর সত্তাকেই জীবনের চূড়ান্ত ও একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমরা শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে পারি। তিনি যাবতীয় অনুগ্রহ দানের ক্ষমতা রাখেন। "আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো সত্তা নেই যা তাঁর আত্মা বহির্ভূত কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর।"

তাওহিদের এই তাৎপর্য ও দাবি মন-মগজে বদ্ধমূলের কারণেই মানুষের মর্যাদা এমন সমুন্নত হয়েছিল। জনগণ আমির, রাজা-বাদশা এবং ধর্মযাজকদের নিষ্ঠুর নির্যাতন, শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং মানুষ সেই এক আল্লাহর অনুগত হয়েছিল।

আকিদা বিশ্বাসে, প্রশাসনে, শিল্প-সাহিত্যে, কবিতায় এবং যাবতীয় পৌত্তলিকতার বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র হয়ে যায়। ইসলামি শিল্প-সাহিত্য অত্যন্ত

www.pathagar.com

দক্ষতার সাথে সাক্ষর রেখেছে। তাদের চারু ও কারুকলার ক্যালিগ্রাফি, স্থাপত্য শিল্পে অসামান্য অবদান রেখেছে।

তাওহিদ তথা একত্ববাদের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মার মধ্যে এক ঐক্যের সৃষ্টি হয় এবং ইসলামি শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত উপায়-উপকরণের ওপর ছাপ পড়ে। এ কারণেই ইসলামে দাওয়াত ও জাতীয় ঐক্য বিরাজ করে। বিরাজ করে সাধারণ সামাজিক উদ্দেশ্য অবকাঠামো অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ চিন্তার প্রণালীতে।

তাদের রকমারি শিল্পকর্মে ও রুচি-পদ্ধতিতে ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। স্পেনের হাতির দাঁতের টুকরায়, মিসরের বোনা কাপড়, মৃৎপাত্র, ইরানের ফুল, লতাপাতায় গালিচার ডিজাইন, বাস্তব গহনা-পত্র আকৃতির বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একই রকম সাদৃশ্য বিদ্যমান।

পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন সমগ্র মানবজাতিকে ভৌগোলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন : হে মানব জাতি আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে কেবলমাত্র পরিচয় আদান-প্রদানের সুবিধার্থে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছি। তবে তোমাদের মধ্যে যে বেশি খোদাভীরু সে শ্রেষ্ঠতম।

- আল হুজরাত : ১৩

মহান আল্লাহ পবিত্র আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন, সত্য, ন্যায়, সততা ও তাকওয়াপরায়ণের উপর বিশ্বমানব ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। তখন ইসলাম কর্তৃক বিজিত প্রতিটি জাতির জ্ঞানী-গুণী মেধাবী লোকদের নিয়েই সভ্যতার মালা গাঁথা হয়েছে। অন্যান্য সভ্যতায় একই বংশের জ্ঞানী বা নায়করা লোকদের নিয়ে গর্ব করে আর ইসলামি সভ্যতা সমস্ত জাতির ও গোত্রের মহানায়কদের নিয়ে গর্ব করে। এ সভ্যতার নির্মাণে অবদান রেখেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, শায়েখ আহমাদ খলিল, সিবাওয়ায়, আল কান্দি, আল ফাররা, আল ফারাকি, ইবনে সিনা, গাজ্জালি, ইবনে রুশদ, বুখারি, মুসলিম প্রমুখ। তিরমিযী প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন অঞ্চলের হলেও তাঁরা

www.pathagar.com

ইসলামের সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তাঁদের মাধ্যমেই ইসলামি সভ্যতা বিশ্ব মানবদেহ সুস্থ চিন্তা সর্বোত্তম ফসল উপহার দিয়েছে।

ইসলামের নৈতিক, চারিত্রিক মূলনীতিগুলোকে তার সমগ্র সমাজ, রাষ্ট্র কাঠামোতে যাবতীয় তৎপরতায় সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়া হয়েছে। এই মূলনীতিগুলোকে কখনোই অবজ্ঞা করেনি এবং শাসকমহলে দল উপদলে ও ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে ও সুবিধা আদায়ের মাধ্যম বানায়নি। সরকার গঠন, শাসন পরিচালনায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে, আইন প্রণয়নে, যুদ্ধ ও সন্ধিতে এবং অর্থনৈতিক, পারিবারিক কর্মকাণ্ডে নৈতিক মূলনীতিসমূহ ও দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইসলামি সভ্যতা এ ক্ষেত্রে পূর্ণতার সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হয়েছে। নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তাকে শুধু বিস্ময়কর বলাই যথেষ্ট নয়, বিশ্ব ইতিহাসে নতুন বা পুরাতন সভ্যতাই এ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। এই ইসলামি সভ্যতাই মানবজাতিকে সত্যিকার সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাক থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেছে।

ইসলামি সভ্যতার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হক ও ন্যায়নীতিভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যা ধর্ম ও আকিদা বিশ্বাসকেন্দ্রিক। অথচ ধর্ম ও রাষ্ট্রের উন্নতি ও প্রগতি এবং সভ্যতার বিকাশকে বিন্দুমাত্রও ব্যাহত করেনি; বরং ধর্ম হচ্ছে উন্নতি ও প্রগতির নিশ্চয়তা বিধানকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বাগদাদ, দামেস্ক, কায়রো, কর্ডোভা ও গ্রানাডার মসজিদের চত্বর থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে তা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেছিল। ইসলামি সভ্যতাই বিশ্বের একমাত্র সভ্যতা, রাষ্ট্র ও ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে না।

ইসলামি সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে যথার্থ ভারসাম্য রক্ষা করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিটোল ও নির্ভুল নীতিমালার প্রতি আস্থাশীল। সবচেয়ে পবিত্র বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালার ওপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। একই সাথে বিবেক-বুদ্ধি হৃদয়কে সম্বোধন করেছে এবং চিন্তা ও আবেগকে একই সাথে উজ্জীবিত করেছে। এই সভ্যতার ন্যায়নীতিভিত্তিক এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যা ধর্ম ও আকিদা-বিশ্বাস কেন্দ্রিক। অথচ এতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের উন্নতি ও প্রগতি

www.pathagar.com

সভ্যতা বিকাশে বিন্দুমাত্র ব্যক্ত করেন বরং ধর্মই হচ্ছে উন্নতি ও প্রগতির নিশ্চয়তা বিধান দাবি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

'সমগ্র সৃষ্টি জগতই আল্লাহর পরিবার। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের যত উপকার করবে, সে আল্লাহর কাছে তত প্রিয় হবে'। (বায্যায়) এটাই হচ্ছে ধর্ম, যার উপর ইসলামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এতে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান ধর্মীয়, নেতা, ধনী কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য কোন পৃথক মর্যাদা নেই। সুরা 'আল কাহফে' বলা হয়েছে, 'বল আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ' আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিস্ময়কর ধর্মীয় উদারতা। ধর্মীয় বিধান বলে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতায় এমন উদারতা কখনো দেখা যায়নি, সব ধর্মীয় মানুষদের সমানভাবে দেখার এবং সমান আচরণ করার। যে ধর্মের অনুসারী বিশ্বাস করে যে একমাত্র তার ধর্মই সত্য আর সব ধর্ম ভুল, যে বিশ্বাস করে তার আকিদা-বিশ্বাসই সঠিক ও নির্ভুল। যে ধর্মের অনুসারী বা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় অস্ত্র ধারণ করে অর্ধেক দুনিয়া জয় করার সুযোগ পেয়েছে, আইন-আদালত চালানোর সুযোগ পেয়েও ধর্ম ও শরিয়ত তাকে দেশ শাসনে জুলুম-অত্যাচার ও নিপীড়নে জনগণকে নিজের ধর্ম গ্রহণে জোর জবরদস্তি, বেঈনসাফি করার অনুমতি দেয়নি। সুতরাং পৃথিবীর ইতিহাসে এ সভ্যতা বিস্ময়কর ও নজিরবিহীন উদারতা, নিরপেক্ষতা, সুবিচার ও মানবতাসুলভ আচরণ করেছে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাইয়ের ছেলে মুহাম্মদ বিন কাশিম, রাজা দাহিরকে পরাজিত করার পর দাহিরের কন্যাদেরকে স-সম্মানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার পরও তাদের মিথ্যা অভিযোগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার ভাতিজা নিজে তার মেয়ের জামাতাকেও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

ফাতিমা নামে এক মহিলাকে চুরির অপরাধে রাসূল (সা:) এর কাছে আনা হলে সমাজের কিছু ব্যক্তি তাকে ছাড়ানোর জন্যে তদবির করছিল যে, সে সম্মানিত মহিলা। রাসূল (সা:) রেগে বলেছিলেন যে, 'স্বয়ং আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি এই অপরাধ করত আমি তার হাত কাটতে দ্বিধা করতাম না।' একমাত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানই সভ্যতাকে চিরঞ্জীব ও চিরস্মরণীয় করতে পারে। ইসলামি সভ্যতাই সর্বকালের সেরা। সভ্যতার আসল উদ্দেশ্য ও

www.pathagar.com

লক্ষ্য সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি-প্রগতি ও কল্যাণের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হওয়া। ইসলামি সভ্যতাই এ বিষয়ে কৃতিত্বের সর্বোচ্চ স্বাক্ষর রেখেছে।

আকিদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য ও দর্শন এবং রাষ্ট্র ও সরকারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ও স্মৃতি রেখে গেছে। সপ্তম শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইউরোপে যে সংস্কারমুখী সভ্যতার উত্থান ঘটে, তার উপর ইসলামি সভ্যতার মূলনীতি ও আদর্শের গভীরে প্রভাব পড়েছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় এবং তিনিই সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক, এতে আর কারো অংশীদারিত্ব নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা। ইসলামে পাদ্রি বা পুরোহিত ধরনের কোনো কিছু নেই।

ইতোপূর্বে দুনিয়ার জাতি-গোষ্ঠীগুলো এক নিষ্ঠুর ধর্মীয় একনায়কত্ব ও পৌরোহিত্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল এতে তাদের স্বাধীন চিন্তা ও মতামতের কণ্ঠরোধ এবং তাদের দেহ, সহায়-সম্পদকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ইসলাম যে বিজয় অর্জন করেছিল তার স্বাভাবিক দাবি ছিল আশপাশের জাতিগোষ্ঠিগুলো সবার আগে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-ধারার প্রভাবিত হোক, বাস্তবে তাই হয়েছিল।

বহুসংখ্যক গবেষক জোর দিয়ে বলেন যে, মার্টিন লুথার স্বীয় সংস্কার আন্দোলনে আরব দার্শনিক ও মুসলিম চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মুসলিম পন্ডিতদের লিখিত বহু গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। লুথারের যুগে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধ্যাপনার কাজে এসব অনুবাদ গ্রন্থের উপর নির্ভর করতো।

ফরাসি বিপ্লবে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ছিল মূলত বিকৃত খ্রিস্টীয় পৌত্তলিক ও পাদ্রিতন্ত্রের থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের মুক্তির আন্দোলন।

এক সময় মুসলমানরা বিশ্বকে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্বে দেয়ার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার দিক থেকেও নেতৃত্ব দিয়েছিল। আজকের যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা, তা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের অর্জিত

www.pathagar.com

জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও গবেষণার উপর, মুসলিম মনীষীদের সফলতার উপর।

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রখ্যাত লেখক গোলাম আহমদ মোর্তজা তাঁর 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থের মুসলিমজাতির মূল্যায়ন অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা সেখান থেকে সামান্য কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করতে চাই। যেমন তিনি বলেছেন– 'বিজ্ঞান বিভাগে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায়, রসায়ন বা কেমিস্ট্রির জন্মদাতা মুসলমান। রসায়নের ইতিহাসে জাবিরের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ছোটখাটো জিনিস ধরলে তো ফিরিস্তি অনেক লম্বা হয়ে যাবে। বন্দুক, বারুদ, কামান প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্রের আবিষ্কারও তাঁদের অবদান। যুদ্ধের উন্নত কৌশল ও বারুদ বা আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বিখ্যাত আরবিগ্রন্থ তাঁরাই লিখেছেন বিশ্বাসীর জন্য। সেটির নাম 'আল ফুরুসিয়া ওয়াল মানাসিব উল হারাবিয়া'। ভূগোলেও মুসলমানদের অবদান এত বেশি যা জানলে অবাক হতে হয়। ৬৯ জন মুসলিম ভূগোলবিদ পৃথিবীর প্রথম যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তা আজও বিশ্বের বিস্ময়। তার আরবি নাম হচ্ছে 'সুরাতুল আরদ', যার অর্থ হচ্ছে বিশ্বের আকৃতি। জনাব ইবনে ইউনুসের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমামণ্ডল নিয়ে গবেষণার ফল ইউরোপ মাথা পেতে নিয়েছিল। জনাব ফরগানি, জনাব বাত্তানি ও আল খেরজেমি প্রমুখের ভৌগোলিক অবদান স্বর্ণমণ্ডিত বলা যায়। কম্পাস যন্ত্রের আবিষ্কারকও মুসলমান। তাঁর নাম ইবনে আহমাদ। পানির গভীরতা ও সমুদ্রের স্রোত-মাপক যন্ত্রের আবিষ্কারক ইবনে আব্দুল মাজিদ।'

শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই নয়, মুসলমানদের রচিত প্রাচীন বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহও আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত রচনায় যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। '২৭৫টি গবেষণামূলক পুস্তক যিনি একাই রচনা করেছেন। আহমাদ ও মুহাম্মদ সম্মিলিতভাবে ৮৬০ সালে বিজ্ঞানের একশত রকমের যন্ত্র তৈরির নিয়ম ও ব্যবহার প্রণালী এবং তার প্রয়োজন নিয়ে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।'

'মুসলমানরাই পৃথিবীতে প্রথম চিনি তৈরি করেন। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুজাম আল ইবাদা'র লেখক হচ্ছেন ইয়াকুব ইবনে আব্দুল্লাহ। ৭০২

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দে তুলো থেকে তুলট কাগজ প্রথম তৈরি করেন ইউসুফ ইবনে উমার। তার দু'বছর পর বাগদাদে কাগজের কারখানা তৈরি হয়।'

'জাবির ইবনে হাইয়ান ইস্পাত তৈরি, ধাতুর শোধন, তরল বাষ্পিকরণ, কাপড় ও চামড়া রং করা, ওয়াটার প্রুফ তৈরি, লোহার মরিচা প্রতিরোধক বার্নিশ, চুলের কলপ ও লেখার পাকা কালি আবিষ্কারে অমর হয়ে রয়েছেন। ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড থেকে কাচ তৈরির প্রথম চিন্তাবিদ মুসলিম বিজ্ঞানী জদুবং 'আররাজি'ও অমর হয়ে আছেন। ইংরেজদের ইংরাজি শব্দে এ বিজ্ঞানীর নাম লেখা আছে।'

আর রাজি বা আল রাজি একদিকে যেমন কোরআন-হাদিসে শিক্ষিত একজন বড় মাপের ইসলামি স্কলার ছিলেন, তেমনি আবার তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ গণিত ও চিকিৎসা বিশারদ। 'সোহাগা, লবণ, পারদ, গন্ধক, আর্সেনিক ও সালমিয়াক নিয়ে তাঁর লেখা ও গবেষণা উল্লেখযোগ্য। আরও মজার কথা, পৃথিবীতে প্রথম পানি থেকে বরফ তৈরি করাও তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ইউরোপ পরে নিজের দেশে বরফ প্রস্তুতের কারখানা চালু করে।'

'পৃথিবী খ্যাত গণিত বিশারদদের মধ্যে ওমর খৈয়ামের স্থান উজ্জ্বল রত্নের মতো। ঠিক তেমনি নাসিরুদ্দিন তুসি এবং আবু আলি ইবনে সিনা (ইবনে সিনা) নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।' ইবনে সিনাকে তো আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাসিক সাহিত্য হিসেবে আজও স্বীকৃত।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মানমন্দির আবিষ্কারেও মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীতে প্রথম মানমন্দির আবিষ্কারক হলেন মুসলিম বিজ্ঞানী হাজ্জাজ ইবনে মাসার এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক। সময় ৭২৮ খ্রিস্টাব্দ। তিনি আরো জানিয়েছেন, '৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্দেশপুরে দ্বিতীয় মানমন্দির তৈরি হয়। বাগদাদে হয় তৃতীয় মানমন্দির। দামেস্ক শহরে চতুর্থ মানমন্দির তৈরি করেন আ মামুন।'

মুলমানদের অবদানের কথা স্মরণ না করে ইতিহাস গবেষণা ও ইতিহাস লেখার কথা কল্পনাও করা যায় না। 'ইতিহাসের স্রষ্টা বিশেষত; মুসলমান।'

www.pathagar.com

'মুসলমান ঐতিহাসিকরা কলম না ধরলে ভারতের ইতিহাস হয়তো নিখোঁজ হয়ে যেতো।' আলবিরুনি, ইবনে বতুতা, আলি বিন হামিদ, বাইহাকি, উৎবি, কাজী মিনহাজুদ্দিন সিরাজ, মহীয়ুদ্দিন, মুহাম্মদ ঘোরী, জিয়াউদ্দিন বারণী, আমীর খসরু, শামসী সিরাজ, বাবর, ইয়াহিয়া বিন আহমদ, জওহর, আব্বাস শেরওয়নি, আবুল ফজল, বাদাউনি, ফিরিস্তা, কাফি খাঁ, মীর গোলাম হুসাইন, হুসাইন সালেমী ও সইদ আলী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ' পাক–ভারত উপমহাদেশের যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন ইংরেজরা তার অনুবাদ করেছে মাত্র। আর ভারতীয় ঐতিহাসিকরা সে ইংরেজি অনুবাদের ছাত্র মাত্র।

মুসলমানদের রচিত প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তারিখি ফিরোজ শাহি, তারিখুল হিন্দ, তা'জুম্মাসির, তবকত-ই নাসিরি, খাজেনুল ফতওয়া, ফতওয়া উস সালাতিন, কিতাবুর-রাহলার, তারিখি মুবারক শাহি, তারিখে সানাতিনে, আফগান, তারিখে শেরশাহি, মাখজানে আফগান, আকবর নামা, আইনি আকবরি, মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ, মুনতাখাবুল লুবাব, ফতহুল বুলদান, আনসাবুল আশরাক ওয়া আখরারুহা, ওয়ুনুল আখইয়ার তারিখে ইয়াকুব, তারিখে তাবারি, আখবারুজ্জামান, মারওয়াজুজ জাহার, তামবিনুল আশরাফ, কামিল, ইসাদুল গাবাহ, আখবারুল আব্বাস, কিতাবুল ফিদ-আ, মুয়াজ্জামুল বুলদান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো ইতিহাসের আকর গ্রন্থ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আল কূরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর অপরিসীম উৎসাহ উদ্দীপনার কারণে তাঁর জীবদ্দশাতেই ইতিহাস রচনা ও জ্ঞান-সাধনার যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল, সে ধারাবাহিকতাতেই তাঁর মৃত্যুর পর বাগদাদ, কায়রো, সালেনা ও কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। মহানবীর তিরোধানের ১১৮ বছর পর ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় তথা স্পেন হতে আরম্ভ করে একেবারে উপমহাদেশের সিন্ধুনদ পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়। আর মুসলমানরা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র, পাঠাগার ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে বিদেশী গ্রন্থাকারের উদ্ধৃতি দিয়ে মোর্তজা বলেছেন, 'গ্রন্থ বা পুস্তক সংগ্রহ মুসলমানদের জাতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। বন্দরে বন্দরে লোক প্রস্তুত থাকত, কোনো বিদেশী এলেই তাঁর কাছে যে বইপত্রগুলো আছে সেগুলো নিয়ে অজানা তথ্যের

www.pathagar.com

বইগুলো সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ ও কপি তৈরি করে যার বই তার কাছে ফেরত দেওয়া হোত আর তাঁদের অনিচ্ছা না থাকলে তা কিনে নেয়া হোত।'

মহানবীর সাহাবিগণ বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদিন জ্ঞান-সাধনার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। হয়রত আলির (রা:) চেষ্টায় কুফার জামে মসজিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের ছাত্ররা পড়াশোনার জন্য সেখানে ছুটে যেতেন। হযরত আলি নিজে ছিলেন সেখানকার অধ্যক্ষ। 'হাদিসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' গ্রন্থ মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী লিখেছেন, সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি একটি বড় উট বোঝাই বই রেখে গিয়েছিলেন। স্মরণ করা উচিত, সে সময়ে বই সংগ্রহ করা আজকের দিনের মতো এত সহজ ছিল না। অনুরূপভাবে হযরত আবু হোরায়রার কাছেও বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল। তিনি মহানবীর কাছ থেকে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেছিলেন। 'আরবের বিখ্যাত বক্তাদের সারা জীবনের সমস্ত বক্তৃতাগুলো লিখে নেওয়ার মতো লেখক ও প্রেমিকের অভাব ছিল না। লিখতে লিখতে কাগজ ফুরিয়ে গেলে জুতোর চামড়াতে লেখা হোত। তাতেও সংকুলান না হলে হাতের তালুতে লিখতেও ভ্রূক্ষেপ ছিল না।' এ থেকে বলা যায়, সাংবাদিকতার উন্মেষও হয় মুসলমানদের হাত ধরেই। মোর্তজা জানিয়েছেন সবচেয়ে বিশুদ্ধভাবে বক্তব্য নোট করে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন আবু আমর ইবনুল আ'লা। তিনি এত লিখেছিলেন যে তা ঘরের ছাদ পর্যন্ত ঠেকেছিল।

গণিতশাস্ত্রের পথিকৃতও ছিলেন মুসলমানগণ। মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজেমি ছিলেন বীজগণিতের জনক। পেশায় তিনি ছিলেন খলিফা আল মামুনের জগৎ বিখ্যাত লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। উল্লেখ্য, সে সময়ে লাইব্রেরিয়ানের পদটি ছিল অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। এ পদের অধিকারী হতে হলে ব্যক্তিকে অত্যন্ত মেধাবী ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হোত। তিনি একজন পর্যটকও ছিলেন এবং ভারতেও এসেছিলেন বলে গোলাম আহমদ মোর্তজা জানিয়েছেন। তিনি ভারত বিষয়ে 'কিতাবুল হিন্দ' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজেমি গণিতশাস্ত্রের শূন্যের উদ্ভাবক।

www.pathagar.com

তিনি একজন জ্যোতির্বিদও ছিলেন। বাগদাদের খলিফার অনুরোধে তিনি আকাশের একটি মানচিত্র অংকন করেন এবং একটি পঞ্জিকা রচনা করেন।

এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশে মুসলমানরা পথ দেখিয়ে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম শাসকদের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেই সোনালি ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হলে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতেই হবে।

ইসলামি শিল্প, সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি স্থাপত্য আইন, দর্শন তাক লাগিয়েছিল, আরোহণ করেছিল উন্নতির শীর্ষ চূড়ায়।

ইসলামি শিল্পকলা : সমগ্র আসমান-জমিন এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সৃষ্টির সেরা মানুষকে চলার বিধান হিসাবে আল কুরআন নাজিল করেছেন। আল কুরআনের প্রতিটি আয়াত, শব্দ, ধ্বনি আল্লাহতায়ালার। ছয় শতকে রাসূল (সা:) মক্কায় আবির্ভাবের পর তিনি মানবজাতিকে অগ্নি, পাথর, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য পাপাচার ছেড়ে এক আল্লাহর পথে ডাকলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হলো তারাই মুসলমান। একাত্মবাদে বিশ্বাসী এই জনসমষ্টির মাঝে এক নতুন সভ্যতার জন্ম হলো যা ছিল পৃথিবীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। একাত্মবাদে বিশ্বাসীদের প্রাণীর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ করে হাদিস এলো। মুসলমান শিল্পীরা থেমে থাকেনি তারা প্রাণীর ছবি বর্জন করে ফুল-লতা-পাতা দিয়ে সন্ডনধর্মী নকশা শুরু করে; তারা 'ফুল-লতা-পাতার ডিজাইন করে ব্যাপক বিকাশ লাভ করে। ইসলামি শিল্পকলা চারটি উপাদানে বিকাশ লাভ করে। যেমন- (১) উদ্ভিদীয় পরিকল্পনা বা ফুল-লতা-পাতার ডিজাইন, (২) জ্যামিতিক নকশায়, আকৃতি ও রেখা। (৩) আরবি বর্ণমালা বা ক্যালিগ্রাফি শিল্প। (৪) স্থাপত্য শিল্প।

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শিক্ষাবিদ শিল্প-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন- 'ইসলামিশিল্পকলার পূর্ণ বিকাশ ঘটে ৮০০ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, এই শতাব্দীতে যে দীপ্ত এবং ঔজ্জ্বল্য এই আধুনিক সভ্য পৃথিবীর কাছে উপস্থিত করেছে তা পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পৃথিবীর যে কোনো সভ্যতার সঙ্গে বিচার করলে অতুলনীয় বলে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

স্থাপত্য

স্থাপত্য শিল্পে মুসলমানরা বিস্ময়কর অবদান রেখেছে, তারা প্রথমে গম্বুজ, খিলান কৌশল উদ্ভব করে স্থাপত্য শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই পদ্ধতিই ছিল অজানা। কোনো দেশ বিজয় করলেই সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হতো। মসজিদের সাথে সুউচ্চ মিনার তৈরি করে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করে এক আল্লাহর পথে কল্যাণের পথে ডাক দেয়া হয়। মসজিদের স্থাপত্যের প্রথম নকশাবিদ হযরত মুহাম্মদ (সা:)। তিনি প্রথম মদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। স্থাপত্য শিল্পে রাসুল (সা:)-এর তৈরি ঐতিহাসিক নিদর্শন মদিনা মসজিদ আজ মডার্ন স্থাপত্যবিদদের কাছে বিস্ময়! একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক স্থাপত্যবিদরা গবেষণা করে মসজিদকে মডার্ন স্থাপত্যের মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলাম ধর্মের সাথে যেমন অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য আছে, তেমনি পার্থক্য আছে শিল্প-সংস্কৃতির। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মন্দির সবার জন্যে উন্মুক্ত নয়, যারা ধর্ম চর্চা করেন শুধুমাত্র তাদের অধিকার রয়েছে উপাসনা করার। তাই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রকোষ্ঠ এমনভাবে তৈরি যেখানে বাইরের আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। পৃথিবীর কর্ম-কোলাহল থেকে মুক্ত হবে। উপাসনার স্থান হিসেবে নির্জন পাহাড় অজান্তকেই বেছে নিয়েছিল বুদ্ধ ভিক্ষুরা, যেখানে পৃথিবীর কোনো কোলাহল স্পর্শ করতে পারে না, ফলে উপাসনার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও সংকীর্ণ মনোভঙ্গির জন্ম হয়েছে তাদের।

আর ইসলাম ধর্মে সমস্ত ভূখণ্ড আল্লাহর। একজন মুসলমান যে কোনো পবিত্র স্থানে নামাজ আদায় করতে পারেন। ধর্মচর্চায় কোনো অন্তরায় নেই। উন্মুক্ততা ইসলামের একটা অংশ। যে কোনো অমুসলিম যে কোনো সময় মুসলমান হতে পারেন। মসজিদের পর্যাপ্ত দরজা-জানালা সহজেই আলো-বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। নির্মাণ কাঠামোয় প্রশস্ততা, ভিতরের স্পেসের সাথে বাইরের স্পেসের একটা সঙ্গতি আছে, অতি সহজেই প্রবেশ করা যায়। কোথাও কোনো বাধা নেই। সবার জন্যেই উন্মুক্ততা। ইসলামের এই উদারতাই তার স্থাপত্যে ব্যক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

ফুল-লতা-পাতার ডিজাইন

প্রাণীর চিত্রাঙ্কনের নিষেধাজ্ঞা করে হাদিস আসলে শিল্পীরা রাসূলের (সাঃ) কাছে গেলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলআল্লাহ আমরা তো এই করে জীবিকা নির্বাহ করি, রাসুল(সাঃ) তাদেরকে নিস্প্রাণ বস্তুর ছবি আঁকতে বলেন। শিল্পীরা নিস্প্রাণ বস্তু হিসেবে আরবের প্রধান বৃক্ষ, আঙ্গুর লতা, খেজুর পাতা, ফুল ইত্যাদি দিয়েই ডিজাইন শুরু করেন। তাদের গালিচায়, পানপাত্রে, জায়নামাজে, মসজিদ, পবিত্র কুরআন অলঙ্করণে, পরবর্তী সময় জ্যামিতিক নকশা ফুল-লতা-পাতা ও ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় করে ডিজাইন করেন যা বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের শুধু দৃষ্টি আকর্ষণই নয়, প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী আঁরি মাতিস সারাজীবন নগ্ন নারীর ছবি এঁকে এঁকে শেষ জীবন ইরানের গালিচায় ফুল-লতা-পাতার ডিজাইন দেখে এতটাই আপ্লুত হয়েছিলেন যে, শেষ জীবনে তার ছবিতে ফুল-লতা-পাতা উজ্জ্বল রং ডিজানিক ফর্মে এসেছে। তিনি তার শিল্পে অবিমিশ্র রং এবং পাশাপাশি সংস্থাপনের মাধ্যমে রংয়ের আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে বলেছেন যে, "একটি সার্থক ছবি হলো সার্থক ডিজাইন।"

জ্যামিতিক নকশা

দার্শনিক প্লেটোর মতে সবচেয়ে মডার্ন শিল্পী হলো জ্যামিতিক নকশা বা জ্যামিতিক ফরম- ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, সিলিন্ডার। ইসলামি নকশা করা ডিজাইনে রয়েছে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বর্ফী, বুটি এইগুলো পার্শীয়ান শব্দ। ইসলামি শিল্পকলায় এই জ্যামিতিক নকশার সাথে ফুল, লতা-পাতা ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় করে বিস্ময়কর ডিজাইন করা হয়েছে মসজিদ ডেকোরেশনে। বাংলাদেশের সবচেয়ে মডার্ন স্থাপত্য সংসদ ভবন, স্থপতি 'লুই কান'। মুসলমানদের দেশ হিসাবে সংসদ ভবন স্থাপত্য ইসলামি ফর্মে জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করেছেন। আমরা দূর থেকে দেখলে সংসদ ভবনকে দেখবো সিলিন্ডার, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত। আধুনিক শিল্পীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী পিকাসোর ছবিতেও রয়েছে ইসলামি জ্যামিতিক মন্ডন কলার প্রভাব; পিকাসোর জন্ম স্পেনের আন্দালুসিয়া অঞ্চলে, যেখানে এক সময় আরবরা সাতশত বছর রাজত্ব

www.pathagar.com

করে, যার ফলে পিকাসোর ছবিতে জ্যামিতিক নিস্তব্ধতার আন্দালুসিয়ার প্রাচীন নকশাকলার প্রভাব রয়েছে।

ক্যালিগ্রাফি

হযরত আদম (আ:) সৃষ্টির পর তাকে যা কিছু জিনিসের নাম শিখিয়েছিলেন অনুমান করা যেতে পারে যে সে ভাষা ছিল আরবি। কারণ কুরআনের ভাষা আরবি। বেহেস্তের ভাষা আরবি। হযরত আদম (আ:)-কে আল্লাহ যে প্রশ্ন করেছিলেন, "আলাস্তু বি রাব্বিকুম? আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আদম (আ:) উত্তরে বলেছিলেন, কালু বালা? কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, আরবিই পৃথিবীর মানুষের মুখে উচ্চারিত প্রথম ভাষা, এই ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর কাছে জিবরাঈল (আ:) প্রথম কুরআনের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। 'ইক্‌রা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক'— পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছে ঘনীভূত রক্তপিণ্ড থেকে' (সুরা আলাক- ১, ২, ৩, ৪)।

আল্লাহ নিরাকার, তাঁকে আমরা দেখি না কিন্তু তাঁর বাণী আল কুরআনের আয়াত আমরা দেখি, তাই মুসলমান শিল্পীরা প্রাণীর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ থাকায় তারা মনের আবেগ মিশিয়ে কুরআনের আয়াতকে বিভিন্ন নান্দনিকতায় প্রকাশ করে শিল্পের সৃষ্টি করে তৃপ্তি মিটিয়েছে। এইভাবে তারা অসামান্য লিপি-চাতুর্য নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে, তারা এই লিপিকলাকে উচ্চাঙ্গ শিল্পে পরিণত করেছে। রাসূল (সা:) স্বয়ং-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হযরত আলি (রা.) একজন ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি বলেন, 'সুন্দর হস্তাক্ষর সত্যকে স্বচ্ছ করে তোলে।'

আরবির এই ২৯ বর্ণ ন্যাচারগতভাবেই শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কোনোটা লম্বা, কোনোটা সমান্তরাল, কাজেই সহজে এগুলো যে কোনো ডিজাইনের সাথে সঙ্গতি রেখে ডিজাইন করা যায়। শিল্পীরা এই বর্ণগুলোকে সৌন্দর্যবর্ধন ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন, তারা এ কাজকে আল্লাহর ইবাদত মনে করেছেন। এই ভাষাকে অবলম্বন করে মুসলিম দেশগুলোতে যে লিখন-শিল্পের বিকাশ গড়েছিল তা আজ সমস্ত বিশ্বের জন্যে অতুলনীয় সম্পদ। আরবি লিপিকলা শুধু ইউরোপে নয়, সমগ্র বিশ্বের শিল্পে এর প্রভাব বিস্তার করেছে, ইউরোপের শিল্পীরা আরবি না জেনেও আরবির বর্ণ দিয়ে

www.pathagar.com

নকশা করেছে। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পল ক্লি-এর 'ডকুমেন্ট' নামে বিখ্যাত ছবিতে কতগুলো আরবি বর্ণ ছাড়া আর কিছু নয়।

বিমূর্ত শিল্পের জনক মন্ডিয়ান, কান্দিনেস্কির ছবিতে আরবি ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পীরা, ক্যালিগ্রাফি শিল্পে মুগ্ধ হয়ে বিমূর্ত শিল্পের জন্ম দিয়েছেন। বিমূর্ত শিল্পে ফিগার নেই, ফর্ম এসেছে শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফির আদলে, ফর্ম ব্যবহার করেছেন তাদের চিত্রকর্মে। পৃথিবীর প্রায় সবগুলো দেশেই আজ ইসলামি শিল্প নিয়ে নিরীক্ষা চলছে, ধর্মগত কারণে নয় শিল্পের বৈশিষ্ট্যগত কারণে। কাজেই ইসলামি শিল্পধারা একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী শিল্পধারা হিসেবে পরিগণিত।

দর্শন ও বিজ্ঞান

চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। ইউরোপে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগরণ ঘটে, ইসাবেলা, কর্ডোভা ও গ্রানাডার মসজিদগুলোতে মুসলিম জ্ঞান তাপসদের কাছ থেকে ইউরোপবাসীদের অর্জিত ফাল্গুধারা থেকেই তার স্ফুরণ ঘটেছিল। পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থীরা যখন এই সব শিক্ষাস্থানে প্রবেশ করতো তখন অবাক হয়ে যেত যে, সাদাকালো নির্বিশেষে যে কোনো আদম সন্তানের জন্যে উন্মুক্ত, যার দৃষ্টান্ত তাদের দেশে ছিল না। মুসলিম জ্ঞানীজনেরা যখন নিজ শ্রেণীকক্ষে পুস্তাকাদিতে পৃথিবীর আবর্তন তার দোত্রাদিতে এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আবর্তন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন ইউরোপীয় মন-মগজে এইসব বিষয়ে নানা অলীক ধারণা ও কুসংস্কার কিলবিল করতো।

ইবনে সিনার 'আল কানুনের' অনুবাদ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। এর চেয়ে বিশাল ও বৃহত্তর গ্রন্থ আর রাযির 'আল হারি'র' অনুবাদ হয় ১৩ শতাব্দীতে। ১৬ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষার এই দু'খানা গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল ছিল।

বিশিষ্ট গবেষক গাস্টা ও লীভানসহ বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বীকার করেন যে মুসলমানরা অন্তত কয়েকশ' বছর ধরে ইউরোপের দর্শন শিক্ষা দিয়েছে এবং

www.pathagar.com

ইউরোপের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বই-পুস্তকই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একমাত্র উৎস। ইবনে সিনার অন্যান্য পুস্তক অনুবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্বিলিয়াতে করা হয়েছে। বেজার বেকন, লিওলর্ড, আর্নো ফিলকোনি, রেমন লাওল, সান সোমা, আলবার্ট, আলগোনিক প্রমুখ পুরোপুরি আরবি পুস্তকের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

মোশে রিনাল বলেন, আলবার্ট দি গ্রেট ইবনে সিনার কাছে এবং সান সোমা ইবনে রুশদের কাছে ঋণী। প্রখ্যাত ওরিয়েন্টালিস্ট সেদিভ বলেন, "মধ্যযুগে একমাত্র আরবরাই ছিল সভ্যতার পতাকাবাহী। আরবরা গ্রিক দর্শনই শুধু বহন করে আনেননি বরং তাকে বিকশিত করেছেন এবং বিশ্ব প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে নতুন নতুন দিক উন্মোচন করেছেন। তারা মহাশূন্য বিজ্ঞান ও গণিতে দক্ষতা অর্জন করেন, এক্ষেত্রে তারা আমাদের উস্তাদ ছিলেন।"

জারবাট সেলদিস্টার (দ্বিতীয়) ৯৭০ থেকে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ মধ্যবর্তী সময় থেকে স্পেন থেকে শেখা জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়। ইংরেজ পণ্ডিত ওহিলাত ১১০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় স্পেন ও মিসর ভ্রমণ করেন। অথচ তখন এই বিষয়ে ইউরোপের হাতেখড়িও হয়নি। আফলাতুল তিফোলি নামক জনৈক পণ্ডিত সিওডাসিয়ানের গ্রন্থ 'আল আরব' আরবি থেকে অনুবাদ করেন। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি আরবদের কাছ থেকে আহরিত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আরজেরা সংক্রান্ত একখানা পুস্তক ১২০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি লেখেন। কাম্বালুস নেভি ১৩শ শতাব্দীতে আরবিতে লেখা জ্যামিতি পুস্তক উফলিদেসের সর্বোত্তম অনুবাদ করেন বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকে। হোমিন্ড লিখেছেন, আরবরাই সর্বপ্রথম রাসায়নিক ওষুধ তৈরির পন্থা উদ্ভাবন করেন। ইবনে সিনার 'আল কানুন', পাঁচ খণ্ডে অনূদিত হয়ে কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে এবং ফ্রান্স ও ইটালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান চর্চার জন্য এর উপর নির্ভর করা হতো।

ভাষা-সাহিত্য

স্পেনীয় কবি সাহিত্যিকরা আরবি সাহিত্য দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আরবি ভাষা সাহিত্য তখনকার সময় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল যা এখনো

www.pathagar.com

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকে প্রভাবিত করে রেখেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ঘোড়সওয়ারী, বীরত্ব, উদাহরণ ও উপমা। চমকপ্রদ রচনাবলী স্পেনের আরবি সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রবেশ করে। স্পেনের খ্যাতিমান লেখক আবানীয় লিখেছেন, 'আরবদের স্পেনের প্রবেশ এবং দক্ষিণ ইউরোপে তাদের আস্তাবল ও ঘোড়া ছড়িয়ে পড়ার আগে ইউরোপ অশ্বারোহণ, যুদ্ধবিদ্যার সাথে পরিচিতই ছিল না। রোজি লিখেছেন, " মেধাবী ও রুচিবান লেখকদের ওপর আরবিসঙ্গীত জাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করে।

চতুর্দশ শতাব্দীতেও ইউরোপের সাহিত্যিকদের লেখায় আরবি সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায়। ১৩২৪ খ্রিঃ বুকাশিও 'দশটি সকাল' নামের যে পুস্তক তাতে তিনি আলিফ লাইলা তথা আরব্যোপন্যাসের অনুকরণ করেন। শেক্সপিয়রও তার নাটকের কাহিনী লিখেছেন, আরব্য উপন্যাস থেকে। দান্তের প্রখ্যাত কবিতা ডিভাইন কমেডি আবুল আলা আল মাযারির 'গুফরান' এবং ইবনে আরাবির জিন সংক্রান্ত রচনাবলী দ্বারা প্রভাবিত। আলিফ লাইলা বা এরাবিয়ান নাটকের ইউরোপের চারশতেরও বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

মাইকেল বলেন, 'ইউরোপ স্বীয় নান্দনিক সাহিত্যে আরবি সাহিত্যের কাছে ঋণী' অনুরূপভাবে মধ্যযুগে ইউরোপে যে সব আধ্যাত্মিক ও চিন্তাগত বিপস্নব এসেছে তার পেছনেও আরবজাতির কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে।

আইন

স্পেনের শিক্ষাঙ্গনগুলো ইউরোপের যে সব ছাত্র অধ্যয়ন করতো তারা মুসলমানদের বহু ফিকাহ শাস্ত্রীয় কিতাবপত্র নিজ ভাষায় অনুবাদ করে নেয়। ইউরোপীয় দেশগুলোতে তখন কোনো ইনসাফপূর্ণ আইন চালু ছিল না, রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল।

নেপোলিয়ান মিসর জয় করে মালেকি মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থাবলী ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রথমে 'কিতাবুল খলিল' অনুবাদ করা হয় যা ফরাসি আইনের ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তখনকার সময়ে ফরাসি আইন অনেকাংশে মালেকি মযহাবের অনুরূপ ছিল। কিতাবুল খলিলের লেখক ছিলেন খলিল বিন ইসহাক বিন ইয়াকুব (মৃত্যু-১৪২২)।

www.pathagar.com

শাসনব্যবস্থা

প্রাচীন ও মধ্যযুগে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ছিল গোলাম এবং মনিবের মতো। শাসকরা ছিল চরম স্বৈরাচার, প্রজাদের সাথে যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করতো। রাজাকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত সম্পদ মনে করতো এবং শাসকরা প্রজাদের ওপর যেমন খুশি তেমন নির্যাতন চালাতো শাসকরাই ছিল ত্রাণ এবং প্রাণকর্তা। ইসলাম এসে ঘোষণা করে : 'আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহর।' মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই।

শাসকরা শুধু জনগণের সেবক, বেতনভুক কর্মচারী, তাদের রক্ষক ও সেবক। জনগণের স্বার্থরক্ষা করা এবং তাদের সেবা করাই তাদের দায়িত্ব। একজন সাধারণ নাগরিকও তার সমালোচনা করতে পারবে। তার কাছে শাসন জবাবদিহিতা করতে বাধ্য; শাসক এবং জনগণের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যেখানে ইউরোপীয় রাজারা সোনার পালঙ্কে, দামি পোশাকে আরাম-আয়েশে জীবনধারণ করেছে আর সেখানে অর্ধপৃথিবীর শাসক হয়েও খেজুর পাতার চাটাই মাটিতে বিছিয়ে শক্ত বালিশে মাথা রেখে জীবন অতিবাহিত করছেন রাসূল (সা:) এবং তাঁর চার খলিফা। একজন সাধারণ প্রজা, সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ খলিফা হযরত উমর (রা:) কাছে জবাবদিহিতা চাইলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি যে লম্বা জামা পরেছেন, তা কোত্থেকে কিভাবে পেয়েছেন, জবাব না দেয়া পর্যন্ত যেন খুতবা না দেন। হযরত উমর তাকে ফাঁসিতেও দেননি জেলেও পাঠাননি বরং সহজভাবে তার প্রশংসা করেছেন এবং সবাই সন্তুষ্ট হওয়ার পর খুতবা শুরু করলেন।

মানব ইতিহাসে তখন প্রথমই দেখা গেল যে, একজন সাধারণ প্রজা রাষ্ট্রপ্রধানকে আসসালামু আলাইকুম। হে বেতনভুক্ত ভৃত্য বলে সম্বোধন করলো এবং রাষ্ট্রপ্রধানও স্বীকার করলেন যে যথার্থই আমি একজন বেতনভুক ভৃত্য। আমার কাজ একজন বেতনভুক ভৃত্যের ন্যায় একনিষ্ঠভাবে জনগণের সেবা করা। ইসলামি সভ্যতা এই মূলনীতি শুধু পোষণ করেননি বরং বাস্তবায়িত করেছেন। এই সব মূলনীতির কারণেই ইসলামিরাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর শাসক দ্বারা নির্যাতিত জাতিগোষ্ঠীগুলো তাদের বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার এই

www.pathagar.com

প্রেরণায় উজ্জীবিত হয় এবং আন্দোলন করে স্বৈরাচার থেকে মুক্তি লাভ করে। ইসলামি সভ্যতা যুদ্ধের বিজিত দেশগুলোর অধিবাসীদের মধ্যেও এমন ধর্মীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা বোধের প্রতিষ্ঠা করেছে, যা মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন।

পাশ্চাত্য ও ইসলামি সভ্যতার সাথে পরিচিত হয় সিরিয়া ও স্পেনের মাধ্যমে। শাসকদের সমালোচনা করা মজলুমকে সাহায্য করা যে মৌলিক অধিকার সে অনুভূতিও তাদের ছিল না। ইসলামের সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হলো। আজ আমাদের মধ্যেও আত্মোপলব্ধি জাগুক, ইসলামি সভ্যতার উত্তরাধিকারের মূল্য উপলব্ধি করি এবং সেই মধ্যবর্তী উম্মত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি যা পৃথিবীতে সত্যের সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে এবং বিশ্ববাসীকে সত্য, ন্যায়, সততা ও সৌজন্যবোধের পথ যেন দেখাতে পারে।

ইসলামি সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মানবপ্রেম; মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সব রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ভালোবাসা, উদারতা, সহযোগিতা ও সাম্যের শিক্ষা। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, 'সকল মানুষ একজন মানুষ থেকেই সৃজন করা হয়েছে।' সূরা নিসার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মানব জাতি তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একজন মানুষ থেকেই সৃষ্টি করেছেন। তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুইজন থেকে বহুসংখ্যক নারী-পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন।'

গরিবের উপর ধনীর, প্রজার উপর রাজার, কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আদম সন্তান মানুষ হিসেবে সবাই সমান। শ্রেষ্ঠত্ব যদি কিছু থেকে থাকে, তা কেবল সততার ভিত্তিতে। আল কুরআনে সূরা হুজরাতের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে। 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত যে সবচেয়ে তাকওয়াবান। সমাজ কাঠামোতেও সকলের অবস্থান সমান যে শক্তিশালী, যে দুর্বলকে সাহায্য করে। এমনিভাবেই গোটা সমাজ প্রতিটি ব্যক্তির সেবকের পরিবর্তন হয়। হাদিসে বলা হয়েছে, 'পারস্পরিক স্নেহ-মমতা, সৌহার্দ্য মুসলমানদের উদাহরণ একটা একক দেহের মতো, দেহের একটা অঙ্গ

www.pathagar.com

যখন রুগ্ন হয় তখন সবকটা অঙ্গই তার সাথে জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হয়'– সহীহ মুসলিম।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন **"হে মানবজাতি"** এবং হে আদম সন্তানেরা বলে সম্বোধন করা হয়েছে এ জন্য যে মানুষের মনে যাতে মানবীয় ঐক্যের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। ইসলাম ক্রমাগত ঘোষণা করেই আসছে, মানবজাতি একক সত্তা। হজ্বেও সবাই একই ইহরামের পোশাক পরে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় এবং কাজগুলো সমাধা করে। সবল-দুর্বল, আপন-পর , ছোট-বড় পার্থক্য থাকে না। ইসলামের আইনের চেয়ে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে এবং ধর্ম-বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ না করে সমগ্র মানবজাতিকে সম্মানের আসনে বসায়, বনি ইসরাইলে আল্লাহ বলেন, 'আমি আদমের বংশধরকে সম্মানিত করেছি।' ইসলামের এই শাশ্বত আল্লাহর বাণী শুধু পবিত্র কোরআনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রতিফলিত হয়েছিল তাদের জীবন-পদ্ধতিতে কৃষ্টি, কালচারে যা পরশপাথরের ছোঁয়ায়ই সোনা হয়ে গেছে। ইসলাম মানে শান্তির সুশীতল ছায়া। কেন ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিল গাণিতিক হারে, তেমনি শিল্প সাংস্কৃতি, সভ্যতায় শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করেছিল।

সাম্যবাদ, ন্যায়পরায়ণতা, মহত্ত্ব, পরস্পর সৌহাদ্য, আন্তরিকতা ও মমত্ববেধের তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি–

প্রথম : হযরত উমর (রা:) জেরুজালেম যাবেন, বাহন একটি উট, যাত্রী দুইজন হযরত উমর এবং তার ক্রীতদাস, ঠিক করে নেয়া হলো প্রথম হযরত উমর (রা:) উটে চড়বে, ক্রীতদাস রশি টেনে নিয়ে যাবে। তারপর ক্রীতদাস উটে চড়বে, রশি ধরে টেনে নিয়ে যাবেন সাম্রাজ্যের বাদশা হযরত উমর। এভাবেই পালাক্রমে দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে তারা জেরুসালেমে পৌছলেন। জেরুসালেমে যখন পৌছলেন তখন পালাক্রমে উটের উপর ছিলেন ক্রীতদাস আর রশি হাতে হযরত উমর। জেরুসালেমের শাসক জ্ঞানী-গুণী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে নগর-দ্বারে উপস্থিত হয়ে অপেক্ষায় ছিলেন, তারা উটের পিঠে বসা ক্রীতদাসকে ফুলের মালা পরাতে গেলেন, ক্রীতদাস ইশারা করে বললেন, আমি নই উটের রশি হাতে উনি হযরত উমর। অভ্যর্থনাকারীদের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল। দু'জনের পোশাকও প্রায়

www.pathagar.com

একই রকম। সাদাসিধা পোশাক পরিচ্ছদ- এই রকম নজির কি ইতোপূর্বে কেউ দেখেছে যে অর্ধপৃথিবীর শাসক উটের রশি হাতে টেনে নিচ্ছে, আর উটের পিঠে ক্রীতদাস। উপস্থিত অভ্যর্থনাকারী জ্ঞানী-গুণীরা বিস্মিত হয়ে গেলেন। এই যদি হয় ইসলামের শিক্ষা, তাহলে আমরা মুসলমান হব। তারা হযরত উমরের হাত ধরে মুসলমান হলেন এবং নগরের দ্বার খুলে দিলেন। বিনা রক্তপাতে জেরুসালেম বিজয় হলো- এই হলো ইসলামের শিক্ষা, ইসলামি সভ্যতা।

দ্বিতীয় : হযরত মোহাম্মদ (সা:) মদিনা থেকে মক্কায় স্ব-দলবলে আসছেন। মক্কার কাফিরদের খাওয়া, ঘুম হারাম হয়ে গেল। মুহাম্মদ আসছেন! তাকে যে অমানবিক নির্যাতন-কষ্ট দিয়ে বিতাড়িত করা হয়েছে, এইবার আর রক্ষে নেই। সব কিছুর প্রতিশোধ নিবে। নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য যে যেদিকে ইচ্ছে ছুটে পালাচ্ছে, পালাচ্ছে নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ফেলে। নিজের জান আগে বাঁচাই। রাসূল (সা:) দেখলেন, এক বুড়ি তার কিছু মাল-ছামানার পুঁটলি নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন, আল্লাহর রাসুলজিজ্ঞেস করলেন, মা! আপনার কী হয়েছে আপনি কাঁদছেন কেন?

বুড়ি মুহাম্মদকে গালাগাল দিয়ে বলেন, আর বলো না বাবা! মুহাম্মদ আসছে! আর রক্ষে নেই! এই ভয়ে আমার আত্মীয়স্বজন, ছেলেরাও আমাকে রেখে চলে গেছে, আমি মালামাল নিয়ে যেতে পারছি না, আর ঐ মুহাম্মদ আসলে তো রেহাই নেই।

মা! আপনি কোথায় যাবেন চলুন। আমি আপনার মাল বহন করে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বুড়ি আগে আগে যাচ্ছে তার আত্মীয় স্বজন যেখানে গেছে সে উদ্দেশ্যে, আর তার পিছনে মাল-ছামানা বহন করে যাচ্ছেন। আল্লাহর নবী, বুড়ি সারাটা রাস্তা মুহাম্মদকে গালাগাল আর অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে। বুড়ি তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আসতেই তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়লো এবং বললো, 'এই বুড়ি তুমি এটা কী করেছ, যার ভয়ে আমরা এত দূর কষ্ট করে পালিয়ে আসলাম, আর তুমি কি না তাকেই নিয়ে আসলে? বুড়ি বিস্মিত হয়ে বললেন, তার মানে?

www.pathagar.com

: মানে তুমি যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, সেই তো মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ!

: বুড়ি শান্ত হয়ে বললেন, এই যদি সেই মুহাম্মদ হয়, তাহলে আমি তার কাছে মুসলমান হবো। সত্যিই বুড়ি এবং তার আত্মীয়রা কালেমা পড়ে ইসলামের সু-শীতল ছায়াতলে এসে গেলে।

তৃতীয় : মসজিদে নববিতে রাসূল (সা:) খুতবা দিচ্ছেন, এই খুতবার মাঝে তিনি তিনবার, আমিন! আমিন! আমিন বললেন। হঠাৎ খুতবার মাঝে আমিন বলায় সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূল (সা:) কেন আপনি আমিন বললেন? রাসুলে খোদা বললেন, এই মাত্র জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, যে প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে পেটপুরে খেল সে আমার উম্মত নয়, তিনবার উনি বলেছেন, আমি তিনবার আমিন বলেছি। প্রতিবেশীর সংজ্ঞাও দেয়া আছে, নিজের ঘর থেকে চল্লিশ ঘর। এর চেয়ে সাম্যের কথা, আর কোন ধর্মে আছে? আজ বস্তুবাদীরা যে সাম্যের কথা বলে তারা কি এরচেয়ে বেশি কোনো দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে?

চতুর্থ: রাসূল (সা:)-এর জীবিতকালেই বনু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নামের জনৈক মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। তাকে রাসূল (সা:)-এর কাছে হাজির করা হয় শাস্তি দেয়ার জন্যে। কোরায়েশদের জন্যে এটা ছিল বিব্রতকর অবস্থা। তারা ভাবলো কাউকে দিয়ে যদি শাস্তিটা মউকুফ করা যায় তাহলে এ যাত্রা সম্মানটা রক্ষা করা যাবে। তারা ভাবলো ছেলে উসামা রাসূল (সা:)-এর প্রিয় পাত্র সুতরাং তাঁকে পাঠিয়ে সুপারিশ করালেই কার্যকর হবে। তারা তাকে পাঠালো। তিনি রাসূল (সা:)-এর নিকট বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। সব শুনে রাসূলে খোদা ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন, তার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি উসামাকে বলেন, 'স্বয়ং আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি হুদুদুল্লাহ-এর ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছো, এতদূর ধৃষ্টতা তোমার?' তিনি সবাইকে জমায়েত করে ভাষণ দিলেন। 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল এই যে, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত ছিল তাদের কেউ অপরাধ করলে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল শ্রেণীভুক্ত হলে তাদের শাস্তি দিত, আল্লাহর কসম। চুরির অপরাধে

www.pathagar.com

যদি মুহাম্মদ (সা:)-এর মেয়ে ফাতিমাও হতো তবে আমি তার ছাড়তাম না।

পঞ্চম : হযরত উমর (রা:) একদিন একটা গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখলেন একটা জীর্ণ-শীর্ণ শিশু দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে। তিনি সাথীদের জিজ্ঞাস করলেন, 'মেয়েটার এমন দুরবস্থা কেন? তোমাদের কেউ কি একে চিনো? আবদুল্লাহ ইবনে উমর; (উমরের ছেলে) কাছে দাঁড়ানো ছিলেন, তিনি এসে বললেন, 'আমিরুল মুমেনিন, আপনি একে চেনেন না! ওতো আমারই মেয়ে। উমর বললেন, তা ওর এমন করুণ দশা কেন? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, আপনার কাছে যা কিছু আছে তা থেকে আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ দেন না, এই কারণে মেয়েটার এই অবস্থা।

হযরত উমর বললেন, আল্লাহর কসম! আমার কাছে তোমাদের জন্যে একজন সাধারণ মুসলমানের সমপরিমাণের চেয়ে বেশি কিছু নেই। চাই তাতে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ হোক বা না হোক। আমার এবং তোমার মধ্যে আল্লাহর কিতাবই ফয়সালাকারী।

ষষ্ঠ : হযরত উমর রাতে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন। এক রাতে তিনি তার ভৃত্য আসলামকে সাথে নিয়ে বের হয়েছেন, তারা চলতে চলতে মদিনা থেকে অনেক দূর চলে এলেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা জানার চেষ্টা করছেন। এক জায়গায় আগুন জ্বালানো দেখে হযরত উমর বললেন, আমার মনে হয় কেউ শীতের রাত গভীর হওয়ায় ওখানে রাত্রি যাপন করছে। তিনি জানার জন্যে দ্রুত পায়ে ওখানে গেলেন এবং দেখলেন এক মহিলার চারপাশে কয়েকটা শিশু বসে আছে, চুলায় একটা হাঁড়ি চড়ানো। শিশুরা কান্নাকাটি করছে। উমর মহিলাকে সালাম জানিয়ে মহিলা কী করছে জানতে চাইলেন। মহিলা বললেন, রাত গভীর এবং কনকনে শীত হওয়ায় আমরা এখানে থেকে গেলাম।

উমর : শিশুরা কাঁদছে কেন?

মহিলা : ওদের ক্ষিদে পেয়েছে।

উমর : ঐ হাঁড়িতে কী আছে?

www.pathagar.com

মহিলা : এতে কেবল পানি আছে। শিশুদেরকে প্রবোধ দেয়ার জন্য এটা চড়িয়েছি। যাতে ওরা চুপ করে ঘুমিয়ে যায়। আমাদের খলিফা উমরের মধ্যে আল্লাহই ফয়সালা করবেন। তিনি আমাদের প্রতি সুবিচার করছেন না।

হযরত উমর : উমর তোমাদের কথা জানবে কী করে?

মহিলা : তাহলে সে খলিফা হয়েছেন কেন? আমাদের অবস্থা সম্পর্কে সে যখন উদাসীন, তখন তার খলিফা হওয়ার দারকার কী ছিল। হযরত উমর তখন তার ভৃত্যকে নিয়ে চলে এলেন এবং আটার গুদামে প্রবেশ করলেন। এক বস্তা আটা ও এক বোতল তেল নিলেন এবং ভৃত্যকে বললেন, আমার ঘাড়ে তুলে দাও। ভৃত্য তার ঘাড়ে তুলে নিতে না চাইলে হযরত উমর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি কি রোজ কিয়ামতের দিন আমার বোঝা বহন করবে? উমর নিজে বহন করে মহিলার সামনে রেখে কিছু আটা বের করে তাকে রুটি বানাতে বললেন, তিনি নিজে চুলোর আগুন আরও তীব্র করতে হাঁড়ির নিচে ফুঁক দিতে লাগলেন। এবং রুটি সেকে শিশুদেরকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালেন। তাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঠায় বসে রইলেন। মহিলা বললেন, "আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। খিলাফতের পদের জন্য উমরের চেয়ে আপনি বেশি যোগ্য।

উমর : প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। কাল যখন তুমি আমিরুল মুমেনিনের দরবারে হাজির হবে, তখন সেখানে তোমার সাথে আমার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

সপ্তম : একবার কোন এক যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েকজন সৈনিককে বন্দী করা হয় এবং একজনকে হত্যা করা হবে, হত্যার আগে বন্দীকে জিজ্ঞেস করা হলো তোমাকে হত্যা করা হবে, তোমার শেষ ইচ্ছে কী? তা আমরা পূরণ করব।

বন্দী : লড়াইয়ের ময়দানে এসে শুনতে পেলাম আমার পুত্রসন্তান জন্ম হয়েছে তাকে এক নজর দেখার ইচ্ছা।

বিধর্মী : তোমার পুত্রকে দেখার কথা বলে পালাতে চাচ্ছ? আমাকে এতটা বোকা ভাবলে কেমনে?

www.pathagar.com

বন্দী : মুসলমান কোনো দিন মিথ্যা বলে না। বিশ্বাস না হলে যেতে দিও না। বন্দীদের একজন তার জিম্মাদার হয়ে অনুরোধ করে বললেন, সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না আসে তাহলে আমাকেই হত্যা করবেন, তবু তার পুত্রসন্তানকে একবার শেষ দেখার সুযোগ দিন।

বিধর্মী কাফের সদয় হয়ে সুযোগ দিয়ে বললেন, সূর্যাস্তের পূর্বেই তাকে পৌছতে হবে, নয়তো তার বন্ধুকে প্রাণ দিতে হবে। বন্ধু তার ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে বাড়ির দিকে ছুটলেন।

এদিকে সূর্য অস্তগত প্রায়। বন্দী এখনো ফিরে না আসায় বিধর্মী সৈনিক তার বন্ধুকে তিরস্কার করে বলছে, ও আর আসবে না। তুমিই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও। তার বন্ধুর বিশ্বাস রাস্তায় আসতে দেরি হচ্ছে, ফিরে আসবেই। তবু সে মাথা এগিয়ে দিলো। জল্লাদ তলোয়ার উপরে তুলে কোপ দেবে এমন সময় দূর থেকে আওয়াজ আসছে। থামুন! আমি আসছি... কিছুক্ষণের মধ্যে বন্দী চলে আসলো। হন্ত-দন্ত হয়ে এসেই তার বন্ধুর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে তার হাত দুটো এগিয়ে দিলো।

বিধর্মী সৈনিক বিস্মৃত হলো, যেন এক নতুন আজব জিনিস দেখছে। ছাড়া পেয়েও শুধু ওয়াদা রক্ষার্থে মৃত্যুর জন্যে দ্রুত এসে তলোয়ারের নিচে মাথা দেয় এ কোন জাতি? বিধর্মী সৈনিক বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে মুক্ত করে দিয়ে তাদের হাতে কালেমা পড়ে ইসলামের সু-শীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

অষ্টম : প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে হযরত উমরের (রা:) রাতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ানো অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এক রাতে মদিনার বাইরে এক জনপদে উপস্থিত হলেন। কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। শব্দটা তাঁবু থেকেই আসছে; তাঁবুর সামনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে, উমর তাকে সালাম দিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলেন। লোকটি জানালো সে একজন গ্রামবাসী। আমিরুল মোমেনিনের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি; কান্নার কারণ জানতে চাইলে লোকটি ক্ষিপ্ত হয়ে যান এবং বলেন, আপনার কাজে যান, এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। হযরত উমর নাছোড়বান্দা, তিনি কারণ না জেনে যাবেন না। লোকটি জানালো তার স্ত্রী প্রসব বেদনায় ছটফট করছে, কান্নাকাটি করছে, তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। উমর চলে এলেন। স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম

www.pathagar.com

বিনতু আলি (রা:)-এর কাছে বললেন, আল্লাহ তোমার জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন একটা পুণ্য কাজ তাতে কি তোমার আগ্রহ আছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে পুণ্য কাজটা কি? উমর তাকে বিশদ বিবরণ দিলেন এবং নবজাতক শিশুর ও তার মায়ের প্রয়োজনীয় পোশাক, খাবার ও ঘি ইত্যাদি সাথে নিতে বললেন। উম্মে কুলসুম ও হযরত উমর (রা:) তাঁবুর সামনে পৌঁছলেন এবং উম্মে কুলসুমকে তাঁবুর ভিতরে যেতে বললেন। তিনি তাঁবুর বাইরে লোকটির সাথে বসে খাবার তৈরি করছেন। ঐ গ্রামবাসী টের পায়নি যে সে পৃথিবীর এক অসাধারণ মানুষের কাছে বসে আছে। ইত্যবসরে তাঁবুর অভ্যন্তরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। উম্মে কুলসুম ভেতর থেকে বললেন, আমিরুল মুমেনিন আপনার বন্ধুকে নবজাতকের সু-সংবাদ দিন। লোকটি উম্মে কুলসুমের কথা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠেলেন। উমরের কাছ থেকে সরে বসতে লাগলেন, কারণ ইতোপূর্বে সে তার সাথে অনেক খারাপ আচরণ করছেন। হযরত উমর বললেন, 'স্বাভাবিকভাবে বসে থাকো, উম্মে কুলসুমকে বললেন, খাবার খাওয়াতে আর তিনি নিজে পুরুষ লোকটাকে খাওয়ালেন। তারপর তাকে বললেন, আমার কাছে এসো। পরদিন আমিরুল মুমেনিনের দরবারে হাজির হয়ে দেখলেন, তার ছেলের ভাতা বরাদ্দ হয়ে গেছে, তিনি নবজাতক এবং তার মা-বাবাকে কিছু উপহার দিলেন।

নবম: এক সময় সালমান ফারসি, সোহায়েব রুমি ও বিল্লাল এক মজলিসে বসে আলোচনা করছিলেন। সে সময় এক মুনাফিক কায়েস বিন মাতাতিয়া সেখানে এসে বলতে লাগলেন, 'আওস ও খাজরাজ যে মুহাম্মদের (সা:) সাহায্য করেছে, সেটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এই তিন অনারবের (সালমান, সোহায়েব ও বিল্লাল) কি হলো বুঝলাম না' হযরত মুয়ায বিন জাবাল পাশেই ছিলেন, তিনি মুনাফেকের কথা শুনে ক্ষুব্ধ হলেন এবং উঠে এসে তার জামার কলার ধরে টানতে টানতে রাসূল (সা:)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তার কথাগুলো জানালেন। রাসুল (সা:)-এর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল এবং তাৎক্ষণিক তিনি মসজিদের নববিতে গিয়ে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন, 'মনে রেখ তোমাদের প্রতিপালক একজন, তোমাদের আদি পিতা একজন এবং তোমাদের দ্বীনও এক। কেউ পিতার ওরস ও মায়ের উদর থেকে আরব হয়ে জন্ম নেয় না। আরবি তো একটা ভাষা, যে ব্যক্তি আরবিতে কথা বলে সে-ই আরব।'

www.pathagar.com

দশম : হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের যুগ এলো বলে। তিনি এমন এক শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন, যার মন আর্তমানবতার প্রতি সহানুভূতিতে বিগলিত থাকতো। খলিফা হয়েও তিনি মহল্লার সেই দরিদ্র মেয়েদের ছাগল দুয়ে দিতেন। একবার এক এতিম মেয়ের ছাগল দুয়ে দিতে গিয়ে, যাদের পিতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, তাদের ছাগল দোহনের সময় তিনি বলছিলেন, 'আশা করি খিলাফতের দায়িত্ব বহন করা সত্ত্বেও আমি এই জনগণের কাজটা চালিয়ে যেতে পারব, যা এযাবত করে এসেছি।'

এগার : ইতিহাসের বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ-এর ছেলে আদি ইসলাম গ্রহণের আগে মদিনায় রাসুল (সা:)-এর কাছে এলেন, সে সময় রাসুল (সা:)-এর আশপাশে ক'জন সাহাবি ছিলেন। তাঁরা সবেমাত্র কোনো যুদ্ধ থেকে এসেছেন, তাদের কাছে যুদ্ধের সাজসজ্জা তখনো ছিল, এগুলো তখনো খুলে রাখেননি। তাদের মধ্যে রাসূল (সা:)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য ও প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে আদি হাতেম তাঈ অভিভূত হয়ে যান। এই সময় মদিনার এক দরিদ্র মহিলা রাসূল (সা:)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে রাসূল আপনাকে আমার সাথে নিভৃতে কিছু কথা বলার আছে, রাসূল (সা:) বললেন, "মদিনার যে গলিতে আপনি বলবেন, সেখানে গিয়ে আপনার কথা শুনতে আমি প্রস্তুত। এরপর তিনি তার সাথে উঠে গেলেন এবং কিছু দূরে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তার কথা শুনে ফিরে এলেন। আদি বিন হাতেম তাঈ এই পরিস্থিতি দেখলেন। তখন তাঁর অকল্পনীয় মানবপ্রীতিতে তিনি এতটাই মুগ্ধ হলেন যে, তাৎক্ষণিক মুসলমান হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

অপসংস্কৃতির কুফল

আজ আধুনিক বিশ্বে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। বেড়ে চলেছে খুন, ধর্ষণসহ নানা প্রকার নেতিবাচক আচরণ। এ আচরণ ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতসহ সকল পেশাজীবী মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। আইন আছে, আদালত আছে, আইনের প্রয়োগ থাকলেও কিছুতেই কিছু যেন হচ্ছে না।

অনেক নারীবাদী সংস্থা ও ব্যক্তিত্ব ভেবেছিলো যে, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থায়ন হলে হয়তো নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস পাবে, সম্মান বাড়বে; সেই সাথে মেয়েরা পূর্ণ স্বাধীনতাও ভোগ করতে পারবে। নারীবাদীদের এ স্বপ্ন খানিকটা সফল হয়েছে বোধ হয়, কিন্তু নারীর মুক্তি আজও আশাব্যঞ্জক হয়নি, এ কথা দ্যার্থহীনভাবেই বলা যায়।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় আগের তুলনায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থায়ন দুটিই হয়েছে। গৃহকর্তী থেকে শুরু করে মেম্বার-চেয়ারম্যান; এমপি-মন্ত্রী, ডিসি-এসপিসহ সবই রয়েছে মেয়েরা। এমনকি বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার সবচেয়ে দায়িত্বশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদ; প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিরোধী দলের প্রধান; এ দুটি পদও দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে রেখেছে দু'জন মহিলা। অনেকে মনে করেন, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নারীর ক্ষতায়ন হয়েছে বাংলাদেশে। এ কথা ঠিক যে, কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থায়ন করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। যে হারে ক্ষমতায়ন হয়েছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে সহিংসতাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য গতিতে।

একথা না বললেই নয় যে, সমাজের সকল পুরুষের ক্ষমতায়ন যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি সকল নারীরও ক্ষমতায়ন যে সম্ভব নয়; তা অনায়াসেই বলা যায়। শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা পৃথিবীতে যেখানে অর্থবিত্ত, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বহু পুরুষকে লাঞ্ছিত হতে হয়; তারই সমজাত পুরুষের হাতে। মাত্র লাখ টাকার সম্পদ সঙ্গে করে দিনদুপুরেও ছিনতাই, লুট হওয়ার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকেন একজন পুরুষ নিজেই; সেখানে অর্থবিত্ত আর ক্ষমতা দিয়ে একজন নারীর শালিতাহানীর প্রতিরোধ হবে কিভাবে? বিষয়টি অনেক বিজ্ঞজনের কাছেই পরিষ্কার নয়।

www.pathagar.com

নারী একজন পুরুষের সম্পত্তি নয়। রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী জাতিকে সম্পত্তি নয়, সম্পদের সাথে তুলনা করেছেন। সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য, কিন্তু সম্পদ নয়। কাজেই নারীর অর্থবিত্ত থাক আর না থাক, সে নিজেই একটি অমূল্য সম্পদ। নারীর নিরাপত্তার দায়িত্ব; ক্ষমতায়ন বা অর্থায়নের ওপর নির্ভর করে না। যদি তাই হতো, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রোমানা মঞ্জুরকে তার চোখ খোয়াতে হতো না। ঢাবির টিএসসি চত্বরে থার্টিফার্স্ট নাইটে বাঁধনকে তার সম্ভ্রম হারাতে হতো না। কিংবা ডাক্তার হোসনেয়ারা, আইনজীবী রেহেনাকে ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হতো না।

আসলে নারীর নিরাপত্তা বা শালিতাহানীর বিষয়টি ক্ষমতায়ন কিংবা অর্থবিত্তের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ নয়। এ সমস্যার সমাধান অন্য কোথাও বা অন্য কোনোখানে।

একথা এখন জোরালোভাবে ওঠে এসেছে যে, মানুষের বা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ছাড়া শুধু অর্থবিত্ত ও ক্ষমতা দিয়ে এসব সহিংসতা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যদি সেটাই হয়; তাহলে আজকের এই সহিংসতার পিছনে কোন শক্তি কাজ করছে? কারা সমাজের এই মানসিকতাকে প্রতিপালন করছে, তাদেরকে আগে চিহ্নিত করতে হবে।

অনেকেই না জেনে নারীর স্বাধীনতার ব্যাপারে ধর্মকে অযথা দোষারোপ করে থাকেন। অন্য ধর্মে কী আছে, সেটা সে ধর্মের লোকদের ব্যাপার, কিন্তু ইসলামে নারীর সম্মান, মর্যাদা, ক্ষমতা, অধিকার ও জীবনবিধান সমুন্নত রাখা হয়েছে। কোথাও কোনো প্রকারে এতটুকুও জুলুম করা হয়নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অনেক বেশিই সম্মান প্রদান করা হয়েছে। রোজ হাশরের ময়দানে স্ত্রীর সার্টিফিকেট ছাড়া কোনো স্বামী মুক্তি পাবে না। স্ত্রী যদি বলে যে আমার স্বামী ভালো তবেই অনন্ত জীবনের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি পাবে। এখন বলুনতো স্ত্রীর কাজ থেকে এই সার্টিফিকেট আদায় করা কতই না কঠিন কাজ এবং তা পেতে হলে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। ইসলামেই মেয়েদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়েছে। ভাই-এর সম্পত্তির অর্ধেক এবং স্বামীর অর্ধেক। ইসলাম বলেছে, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' এভাবেই নারীকে বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে ইসলাম।

সুস্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে যারা, তারা হলো কিছু কুরুচিকর বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, টিভি-সিনেমার প্রযোজক-পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ফ্যাশান শো, বিজ্ঞাপনী সংস্থাসহ কিছু বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন, তারা যে

www.pathagar.com

সরাসরি ধর্ষণের সাথে বা শ্লীলতাহানীর সাথে জড়িত, তেমন কোনো খবর তো আমরা দেখি না? এটা সত্য যে, খালি চোখে তাদের অপকর্মগুলো দেখা যায় না। কারণ, তাদের কৌশলটা মারাত্মক অভিনব। তাদের ঐ অভিনব কৌশলের ফরমেট নারীকে খুব সহজেই ধরাশায়ী করতে পারে এবং তা সম্পূর্ণভাবে হাঙ্গামা মুক্ত। শুধু তাই নয়, তারা এত শক্তিশালী যে, তাদের অপকর্মগুলো সহজেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হয়।

আমরা জানি যে, মেয়েদের শরীর থেকে বস্ত্রহরণ করে তাকে প্রকাশ্য জনসম্মুখে নিয়ে আসা অপরাধ এবং তা নারীর শ্লীলতাহানীরই সামিল। অথচ সেই কাজটিই তারা নাটক, সিনেমা, ফ্যাশান শো, মডেলিং, টিভিবিজ্ঞাপন, সুন্দরী প্রতিযোগিতাসহ নানান প্রকার চরিত্র হননকারী প্রোগ্রামের মাধ্যমে করে যাচ্ছে অবলীলায়। নাটক-সিনেমা কিংবা মডেল-বিজ্ঞাপনের মেয়েরা তো স্বেচ্ছায় বস্ত্রহীনতায় ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে আসে। মনে রাখতে হবে, ইচ্ছে করলেই একজন মানুষ বিবস্ত্র অবস্থায় জনসম্মুখে আসতে পারে না। সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক। কেননা সমাজের একটা মূল্যবোধ আছে, আর সেই মূল্যবোধ পরিপন্থী কাজই বেপরোয়াভাবে চলতে থাকলে সমাজের শৃঙ্খলা ধরে রাখা সম্ভব হয় না এবং সেটাই আজকে অনেক দূর গড়িয়েছে।

একথা না বললেই নয় যে, তথাকথিত এসব বুদ্ধিজীবী ও সংস্থা তাদের নিজেদের মধ্যে লালিত জীবনদর্শন ও আইডোলজিকে সমাজে প্রয়োগ করে, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে অবাধ যৌনাচার বা যৌনস্বাধীনতার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। অবাধ যৌনাচার যে মানবজীবনের শান্তি কেড়ে নিয়ে অস্থিরতা বাড়ায় এবং এতে মেয়েরাই যে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়, এ সহজ সত্যটাকে তারা মেনে নিতে চায় না। ফলে দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে এসব সহিংসতা।

মানুষের মন ও মেজাজ গঠিত হয় সমাজে প্রচারিত সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। সে সংস্কৃতি যদি সুস্থ না হয়, মানুষও অসুস্থ হয়ে বেড়ে ওঠে। একটা কথা প্রায় শোনা যায়; আমরা আজ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের মূল্যবোধ পরিপন্থী যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে; তার ফলাফলই হচ্ছে আজকে নারীর শ্লীলতাহানী বা ধর্ষণ। মিডিয়ায় যে মেয়েদেরকে বেআব্রু করে দেখানো হচ্ছে; তার প্রতিবাদ আমরা আজ পর্যন্ত কেউই করতে পারিনি। পশ্চিমাদের উদাহরণ টানবেন না। তারা পচে গেছে। এই পচন রোধ করার রাস্তা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের থেকে তাদের সমাজে মেয়েদের

www.pathagar.com

অবস্থা আরো বেশি করুণ। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে; পশ্চিমা সমাজে প্রতি দুই মিনিটে একজন মেয়ে ধর্ষিতা হয়। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ পশ্চিমাদের বৈধ কোনো বাবা নেই। বাবা না থাকাটা যে সুখকর কিছু, তা কিন্তু নয়। পশ্চিমাদেশগুলোতে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নয় বছরেও মেয়েরা মা হচ্ছে, জন্ম দিচ্ছে জারজ সন্তান আর এই জারজ সন্তানের লালন-পালনের দায়ভার পড়ছে তার মা-বাবার উপর। অন্যের সন্তান গর্ভে অথবা হাত ধরে বাবার সংসারে নিয়ে আসছে। মা-বাবা এই ভার বহন করতে হিমসিম খাচ্ছে। আজ এই সব বাবা-মা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করছে, 'যে সন্তান ভালো করার জন্য শাসন করতে পারছি না, যে আমাদের উপদেশ মানবে না তার অপকর্মের দায়ভার কেন আমাদেরকে বহন করতে হবে?' পশ্চিমা দেশগুলোতে সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলো জারজ সন্তানের ভারে নুব্জ্য। লাখ লাখ জারজ সন্তান লালন-পালন করতে হিমসিম খাচ্ছে। তারা এখন বিকল্প পথ খুঁজছে। অন্যদিকে ১২-১৩ বছরের মা-বাবা হয়ে পড়াশুনা চুকিয়ে কর্মসংস্থানের খোঁজ করছে অনেক মা-বাবা।

মেয়েরা আজ অধিকারের বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে নেমেছে অথচ বিভিন্ন সংস্থায় যে তাদেরকে বিবস্ত্র করে উপস্থাপন করা হয়, তা বন্ধ করার কোনো দাবি তেমন একটা চোখে পড়ে না। কেনো? কাদের ইঙ্গিতে এতবড় একটা বিষয়কে তারা পাশ কাটিয়ে যায়?

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিগত কয়েক দশকের পত্রিকার খবর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যারা ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে না, যারা বামপন্থী, যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, যারা নারী-স্বাধীনতার নামে প্রতারণা করে; তাদের দ্বারাই মেয়েরা সবচেয়ে বেশি শ্লীলতাহানীর স্বীকার হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে জাতি যে চোখে অন্ধকার দেখবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ধর্ষণ ছেলেরাই করে। কেননা ছেলেদের মানসিকতার কোনো উন্নতি হচ্ছে না বরং অবনতির দিকেই ক্রমান্নয়ে এগিয়ে যাচ্ছে; আর তাতে রসদ যোগাচ্ছে আমাদের শিক্ষা, নিজদেশী ও পরদেশী অপসংস্কৃতি। তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাবে ভিতরে ভিতরে আমাদের যুবসমাজ পর্নগ্রাফি আর যৌনতা নিয়ে মেতে ওঠেছে। বিকৃত রুচিতে অভ্যস্ত হয়ে মেয়েদেরকে তারা পণ্য ভাবতেই বেশি পছন্দ করছে। সেই ভাবনাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আরো বেশি বেগবান করে তুলছে। সংস্কৃতিতে যৌন সুড়সুড়ির ছন্দ থাকবে, আর সেই ছন্দে ছেলে-মেয়েরা নাচবে না, এমন ভাবাটা বাতুলতা মাত্র। আসুন যে সংস্কৃতি মানুষ মানুষের সম্মান ও মর্যাদা দিতে শেখে সেই সংস্কৃতি লালন করি, বাকিগুলো প্রতিরোধ করি।

www.pathagar.com

আমাদের করণীয়

শিল্প, সংস্কৃতি, সভ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী, শিল্পতাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামতকেও আমরা আমলে নিচ্ছি না। আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, 'আনন্দ-তৃপ্তি মানুষের পেটের ক্ষুধা এবং যৌন ক্ষুধার মতোই তীব্র।' সুতরাং আমরা যদি সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর পাপাচারমুক্ত সংস্কৃতি দিতে ব্যর্থ হই, তবে সাধারণ জনগণ পাপাচারের পথে ধাবিত হতে বাধ্য। যা বর্তমানেও হচ্ছে, বিশেষ করে আমরা যারা সুস্থ, সত্য সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখি তাদের উপরেই এ দায়িত্ব বর্তায়। এই বিষয়টি নিয়ে তাদেরকেই চিন্তা করতে হবে। ইসলাম মানেই প্রগতিশীল, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। সুতরাং ইসলামি শিল্প-সংস্কৃতি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। ইসলামই পাপাচারে লিপ্ত মানুষগুলোকে পরশ পাথরের মতো সোনায় পরিণত করেছিল। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সভ্যতাকেও প্রভাবিত করেছিল। আজও সে রকম উজ্জীবিত করা সম্ভব, প্রয়োজন শুধু যোগ্য লোক এবং সুচিন্তিত কর্মপন্থার। সে কর্মসূচি নেয়া এখন সময়ের দাবি।

বর্তমানে আমরা অজ্ঞতাবশত সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা না করায় এবং পৃষ্ঠপোষকতা না দেয়ায়, আমরা অন্যদের প্রভাবিত করা তো দূরের কথা, নিজেরাই জাহেলিয়াতের কালচারে ক্রমাগত নিমজ্জিত হচ্ছি। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আকিদা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতাকে নিঃশেষ করে দেয়া হচ্ছে। স্লো পয়জনের মতো তারা অপসংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমাদের কচি কচি নিষ্পাপ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দেহে, যা হিরোশিমার এটমের চেয়েও মারাত্মক। এখন এমন মনে করা নির্বুদ্ধিতা যে, আগ্রাসী শক্তি আগের মতো খোলা তালোয়ার হাতে ঘোড়ায় চড়ে দেশ জয় করতে আসবে। সংস্কৃতি এখন আগ্রাসনের হাতিয়ার, যা আমাদের জাতিসত্তাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। হৃদয় মনে স্থান করে নিচ্ছে অপসংস্কৃতি। আমাদের ভূখণ্ডে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে যদি আমরা সফলও হই আর কালচারালভাবে সফল না হই তবে রাজনৈতিক সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অর্থনীতি ও

www.pathagar.com

রাজনীতিতে সফল হওয়া আর ঈমান রক্ষা এক কথা নয়। সবার আগে প্রয়োজন ঈমানের হেফাজত। আর তা সংস্কৃতির মাধ্যমেই সম্ভব। আমরা লাখ লাখ সিনেমার হল, শিল্পকলা একাডেমি, নাট্যশালা এবং বিভিন্ন পার্বণগুলোতে কি করবো? এগুলো বন্ধ করে দেবো? এমনটা ভাবা কি আদৌ বাস্তবসম্মত? আমরা চাইলেই কি এসব বন্ধ করে রাখা সম্ভব হবে? এর পরিণতি কী হতে পারে ভেবেছেন? পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দুইটি বড় ইসলামি উৎসব। অথচ এই দুইটি ঈদের অনুষ্ঠানে যে কালচার আমরা দেখি তা কতটুকু ঈদের অনুষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? কতটুকু ইসলামিক? সাহিত্য বলুন, সংস্কৃতি বলুন সর্বত্র অপসংস্কৃতির সয়লাব। জাতীয় পত্রিকাগুলোতে যে লেখা প্রকাশিত হয় তার কয়টাতে ঈদের নির্মল আনন্দ থাকে? টিভি চ্যানেলগুলোতে চাঁদ দেখার পর থেকেই শুরু হয় নৃত্য, অশ্লীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। পহেলা বৈশাখ বাঙালি মুসলমানদের সন, এই উপলক্ষে পুঁজিবাদীরা যে কর্মকাণ্ড ঘটায় তা কি আমাদের সংস্কৃতি? শুধু সমালোচনা করে গলা ফাটালে কোনো লাভ হবে না। বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্বার গতিতে কাজ করতে হবে। আমার এ মতের সাথে খুব কম লোকই দ্বিমত পোষণ করবেন। সমস্যা দেখা দেয় যোগ্য লোককে উপযুক্ত কাজ দিতে গিয়ে। যোগ্য লোকরা সাধারণত চাটুকার হয় না, কিন্তু আমরা চাটুকারদেরই বেশি পছন্দ করি। ফলে অযোগ্য চাটুকারদের হাতে কাজের ভার দিয়ে পাহাড় সমান অপসংস্কৃতি পাল্টে দিতে চাই। এ মানসিকতা পাল্টাতে না পারলে পরিকল্পনার 'পরী' উড়ে যাবে 'কল্পনা' মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে মাটিতে। তাই আমি মনে করি, খুব শীঘ্রই কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে যোগ্য লোককে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন সেক্টরের দায়িত্ব দিতে হবে আলাদা আলাদা লোকের হাতে। তাদের কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে, তবে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন এবং সমন্বয়ও করতে হবে। সেক্টরভিত্তিক আলাদা বাজেট এবং বার্ষিক টার্গেট নির্ধারণ করে দিতে হবে। এমন লোকদের কাজ দিতে হবে যারা সুচিন্তিভাবে সময় উপযোগী সিলেবাস চালু করে কোর্স বা ডিপেস্নামা পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী ক্লাস নেবেন।

নবী রাসূল, সাহাবীগণ, মুজাদ্দেদ, বিভিন্ন ইসলামি মনীষী ব্যক্তিত্বদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে তা যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় সে ব্যবস্থাও নিতে হবে। ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানা এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। শিল্প সংস্কৃতির শুধু বাহন নয়, সমাজ পরিবর্তনের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমাজে তা চালু করাও জরুরী। সর্বক্ষেত্রে ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটানোর জন্য ইসলামি জনতাকে সচেষ্ট এবং ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ইসলামের কুরআন, হাদিস, ইসলামি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কাব্য, সাহিত্য, গল্প, নাটক, সিনেমা, উপন্যাস রচনার জন্য লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। শিল্পীদের সম্মানী দিতে হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে উজ্জীবিত করা, গণচেতনা জাগ্রত করা ছাড়া অপসংস্কৃতির সয়লাব রোধ করা সম্ভব নয়। পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বাড়াতে হবে। ব্যবহার করতে হবে সকল অডিটোরিয়াম, হলরুম, প্রদর্শনীর গ্যালারি।

সু-পরিকল্পিতভাবে ইসলামি ব্যক্তিত্ব তৈরির লক্ষ্যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে গবেষক তৈরি করতে হবে। যে, যে বিষয়ে আগ্রহী তাকে যে বিষয়ের ওপর নিরীক্ষাধর্মী কাজ করতে হবে। এই সব কাজ কোনোভাবে দায়সারা ধরনের হবে না, আল্লাহর দেয়া সৃজনশীল চিন্তা সবটুকু ঢেলে দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটিই তুলে আনতে হবে। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে সে বিষয়ে। মনে রাখতে হবে এখন সবজান্তা নয়, বিশেষজ্ঞের যুগ। ভাষাবিদ, পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'যে দেশে জ্ঞানী লোকের কদর নেই সে দেশে জ্ঞানী লোক জন্মায় না।' তার মানে, সে সমাজে জ্ঞানী লোকের কদর নেই সে সমাজে জ্ঞানী লোক জন্মায় না। যে দলে জ্ঞানী লোকের কদর নেই সে দলে জ্ঞানী লোক জন্মায় না।'

আমরা যে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করছি এই সমস্যা আমাদের তীব্র। আমরা কবি-সাহিত্যিক শিল্পীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি। মর্যাদা তো দূরের কথা, সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতেও ব্যর্থ। আজ লিখতেও লজ্জা হচ্ছে যে, সামান্য খাওয়া পরা এবং চিকিৎসার অভাবে অসামান্য অনেক প্রতিভাবান হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ হাদিসে বলা আছে; 'তোমরা কেউ যদি দুস্থ কবি-শিল্পীদের সাহায্য করো তবে সে যেন তার মাতা-পিতাকে সাহায্য করলো।' কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকরা দেশ ও জাতির সম্পদ, কারণ এরা দেশ ও জাতি নিয়ে চিন্তা করে, ব্যক্তিচিন্তা, আত্মচিন্তার মতো তাদের সংকীর্ণ মন নয়। তাদের মন প্রশান্ত মহাসাগরের মতো উদার। মেঘমুক্ত আদর্শের মতো পবিত্র। সুতরাং এদের চিন্তা সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই করতে হবে। যারা ইসলামের বিজয় চান তাদেরকেই করতে হবে।

www.pathagar.com

শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার কাজ স্বভাবগতভাবেই বিত্তবানদের ওপর নির্ভরশীল। এক সময় রাজাবাদশারা পৃষ্ঠপোষকতা করতো; এখন করে পুঁজিপতিরা, কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা, আধিপত্যবাদী মাড়োয়ারিরা, ধর্মনিরপেক্ষবাদী লুটেরা শোষকরা। তারাই কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের তাদের কর্ম সাধন ও পণ্য প্রচারের জন্য ব্যবহার করছে, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করছে। স্বভাবতই তারা যা বিনিয়োগ করছে লাভ তুলে নিচ্ছে তার হাজার গুণ।

ইসলামকে এরা যেমন তাদের স্বার্থের প্রতিপক্ষ মনে করে তেমনি প্রতিপক্ষ মনে করে ইসলামি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের। ফলে পুঁজিপতি, কর্পোরেট ব্যবসায়ী, আধিপত্যবাদী মাড়োয়ারি, ধর্মনিরপেক্ষবাদী লুটেরা শোষকরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে এমনটা কল্পনা করাও অন্যায়। কায়েমি স্বার্থবাদী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার তো প্রশ্নই উঠে না। অথচ পানি ছাড়া যেমন বৃক্ষ বাঁচে না, পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তেমনি শিল্প-সাহিত্যও বাঁচে না। কাজেই কেউ যদি চান এখানে ইসলামের বিজয় ঘটুক, ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটুক তবে পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বটা তাদের নিতেই হবে। বিশেষ করে যারা এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন এ ক্ষেত্রে তাদের পালন করতে হবে গুরু দায়িত্ব। এ ছাড়া বিভিন্ন ইসলামী সমিতি, সংগঠন, ইসলামি ব্যাংক-বীমা, বিত্তবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে। আমরা যারা মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তাদের ভেবে দেখা দরকার ঈমান রক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক কার্মকাণ্ডও আজ যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার। নইলে হাদিসের সেই সময়টির সম্মুখীন হতে হবে যেখানে বলা হয়েছে, এমন এক সময় আসবে যখন কারুকার্যময় মসজিদ থাকবে, কিন্তু সেখানে নামাজ পড়ার জন্য কোন মুসল্লি পাওয়া যাবে না।

একজন লেখক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার একশটি পাণ্ডুলিপিও যদি লিখে ড্রয়ারে রেখে দেয় তবে সমাজের কোনো উপকারে আসবে না, যদি তা প্রকাশ করে মানুষের হাতে না পৌঁছে। একজন চিত্রশিল্পী যদি হাজারটা চিত্রকার্য বা ক্যালিগ্রাফি এঁকে স্টোর রুম ভর্তি করে রাখে, যদি প্রদর্শনী না করতে পারে তবে তাও কোনো কাজে আসবে না। তেমনি চলচ্চিত্র এবং নাট্যশিল্পেও।

কাজেই বাংলাদেশে ইসলামি কালচার ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তার পৃষ্ঠপোষকতায় বিত্তবানদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। শিল্পী, সাহিত্যিকদের কাজের মূল্যায়ন করে তাদের যথাযোগ্য পুরস্কার

www.pathagar.com

দিতে হবে, সম্মান দিতে হবে। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না। মৃত্যুর পর দেয়া না দেয়া একেবারেই সমান। মরা ঘোড়াকে যতই ঘাস দেন, সে আপনাকে নিয়ে মরু পাড়ি দিতে পারবে না। ঘাস যদি দিতেই চান জীবিত ঘোড়াকে দেন, সে আপনার কিছুটা হলেও কাজে লাগতে পারে। কারণ পুরস্কার দেয়াই হয় উৎসাহের জন্যে। কেউ যদি তার কাজের স্বীকৃতি পায় তবে সে উৎসাহ পেয়ে কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়। সক্ষম অবস্থায়ই এটা দেয়া উচিত, বার্ধক্যে নয়। তবেই আমাদের মাঝে জন্ম নিবে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। জন্ম নিবে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক।

নজরুলের ইসলামি গান শুনলে এখন আমাদের চিত্ত উথলে ওঠে। আমাদের কোন ইসলামি পর্বই নজরুল ছাড়া হয় না। অথচ তার বিরুদ্ধে ফতোয়ার কোন অভাব ছিল না। নজরুলকে যারা নাকচ করেছিল তাদের পদ্ধতি এস্তেমাল না করে যার যতটুকু ভাল আছে সেটুকু গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারলে অন্তহীন আফসোসই হবে আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমাদের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠন, সমিতি, ইসলামি ব্যাংক-বীমা, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, বিত্তবান সমাজসেবক ও সামর্থ্যবান প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিরা কি সময় থাকতে এ কথাটুকু বুঝবেন? এ দেশে ইসলামি সাহিত্য সংস্কৃতি বিস্তারে তারা একটু ভূমিকা রাখবেন? যেমন রেখেছিলেন আমাদের নবী এবং নবীর প্রিয় সাহাবীরা? #

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

পাক বাংলার কালচার :	–	আবুল মনসুর আহমদ ঢাকা আহমদ পাবলিশিং হাউজ।
অপসংস্কৃতির বিভীষিকা :	–	সালাউদ্দিন আহমেদ জহুরী
শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য :	–	সৈয়দ আলী আহসান শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা।
ইসলামী সংস্কৃতি:	–	আসান বিন হাফিজ প্রীতি প্রকাশনী।
ইসলামী সংস্কৃতির ও প্রকৃতি স্বরূপ :	–	ডঃ মুহাম্মদ রেজাউল করিম ইউনিভার্সাল ইসলামি থ্যট।
ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি :	–	ড. আলিজা উজ্জত কোবিচ
ইসলাম ও সংস্কৃতি :	–	ড. আলিজা উজ্জত কোবিচ
ইতিহাসের ইতিহাস :	–	গোলাম আহমদ মোর্তজা
চেপে রাখা ইতিহাস : .	–	গোলাম আহমদ মোর্তজা
ইসলামী সংস্কৃতির রাজনীতি :	–	ড. আব্দুর ছাত্তার
সিরাতুন্নবী (সাঃ), ঢাকা :	–	ইবন হিমাম ইসলামি ফাউন্ডেশন।
আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ	-	মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।
তাওহীদ রিসালাত আখিরাত :	–	মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মুওদূদী আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা :	–	মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মুওদূদী আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম	–	আবদুল মান্নান তালিব আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
মুসলিম সংস্কৃতি :	–	এ. জেড. এম শামসুল আলম মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা।
শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি :	–	মুহাম্মদ আব্দুর রহীম জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৪ খ্রী.।
ইসলামী সংস্কৃতি :	–	মুহাম্মদ মতিউর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
বাংলার লোক সাংস্কৃতি, ঢাকা :	–	ড. ওয়াকিল আহমদ
বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস :	–	ড. এম এ রহীম
সাংস্কৃতিক আগ্রাশন ও প্রতিরোধ :	–	আরিফুল হক
খিলাফতে রাসেদা	–	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম।
History of Art :	–	German Barin Lonbdon 19961

History of Art Criticism, by Lionel Ventura New York Prehistoric ant Ancient by Paul Homily London A concise History of Model painting by. Her Bert Road London-1961. A concise His Tory of Art by German Barin London 1961. বাগেশ্বরী শিল্প প্রাবন্দাবলী - অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর- রূপ কলিকাতা।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে ২৫ জন নবী ও রাসূলের কাহিনী বইয়ে মাওলানা জাকির হোসেন আজাদী।

www.pathagar.com

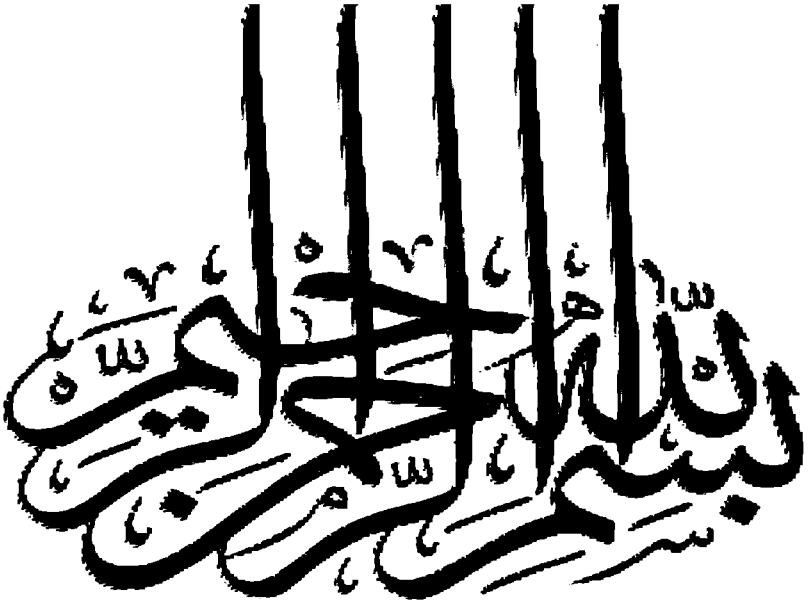

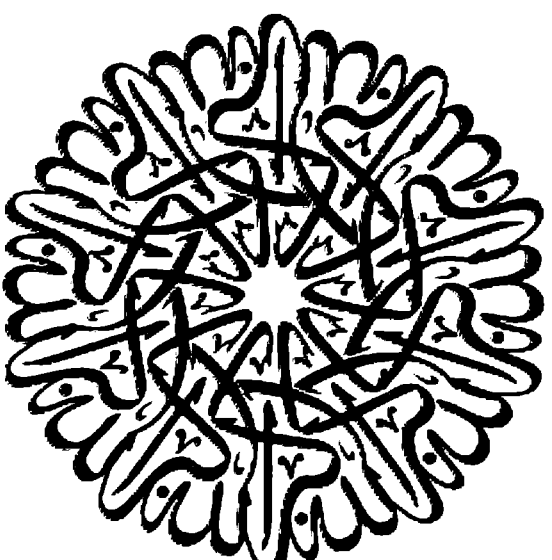

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

www.pathagar.com

ক্যালিগ্রাফি পেইনন্টিং/বদরের যুদ্ধারা

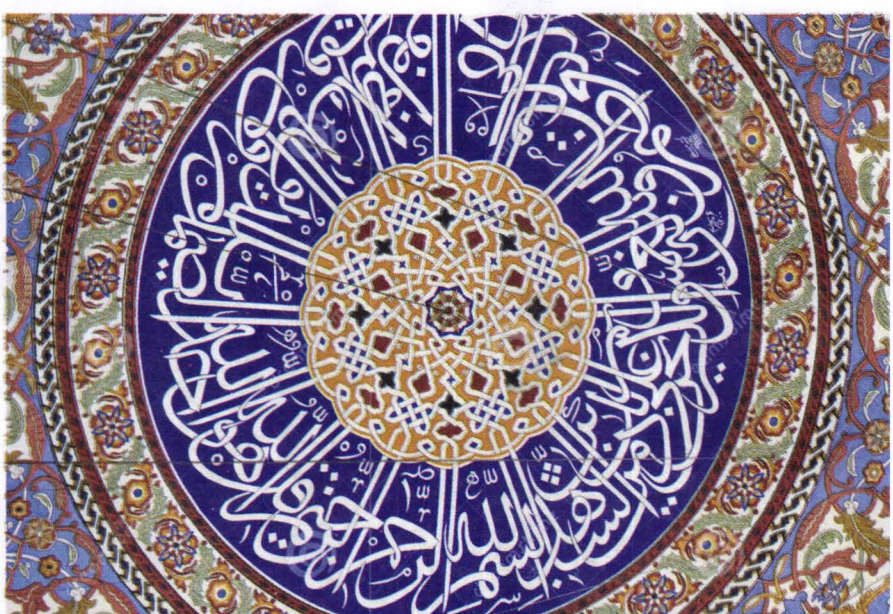

মসজিদ অলংকরণে ক্যালিগ্রাফি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

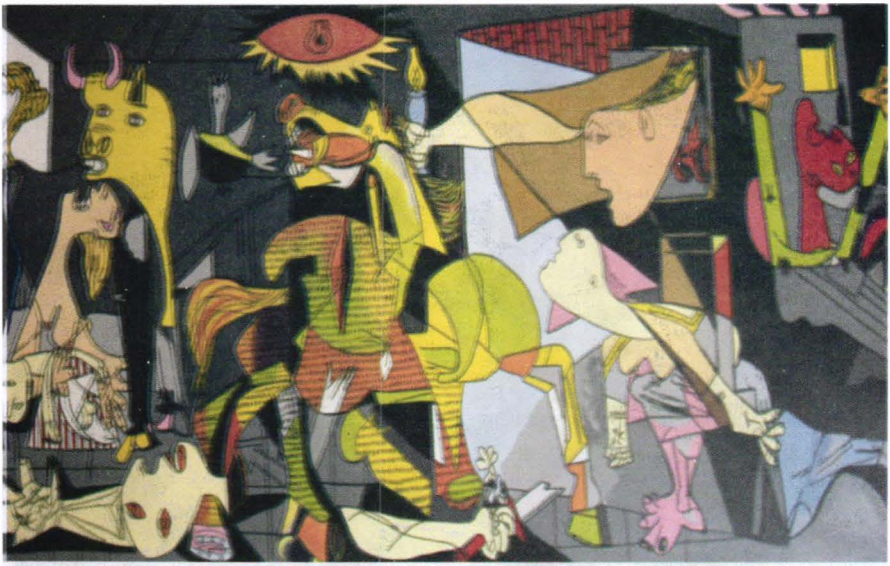

পাবলো পিকাশোর বিখ্যাত শিল্পকর্ম গুয়েরনিকা

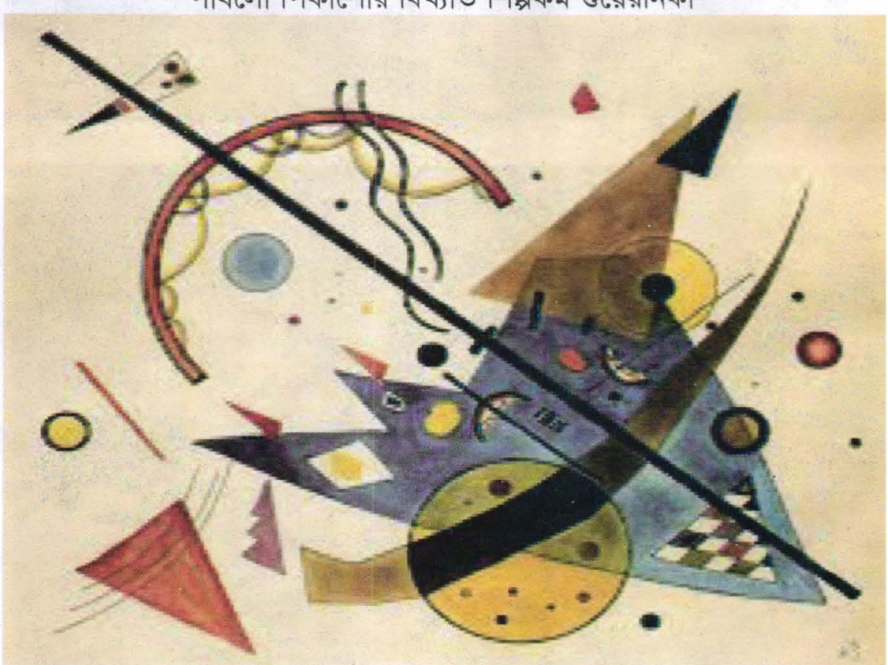

বিমূর্ত শিল্পের জনক কান্দিনিস্কির বিমূর্ত শিল্প কর্ম

www.pathagar.com

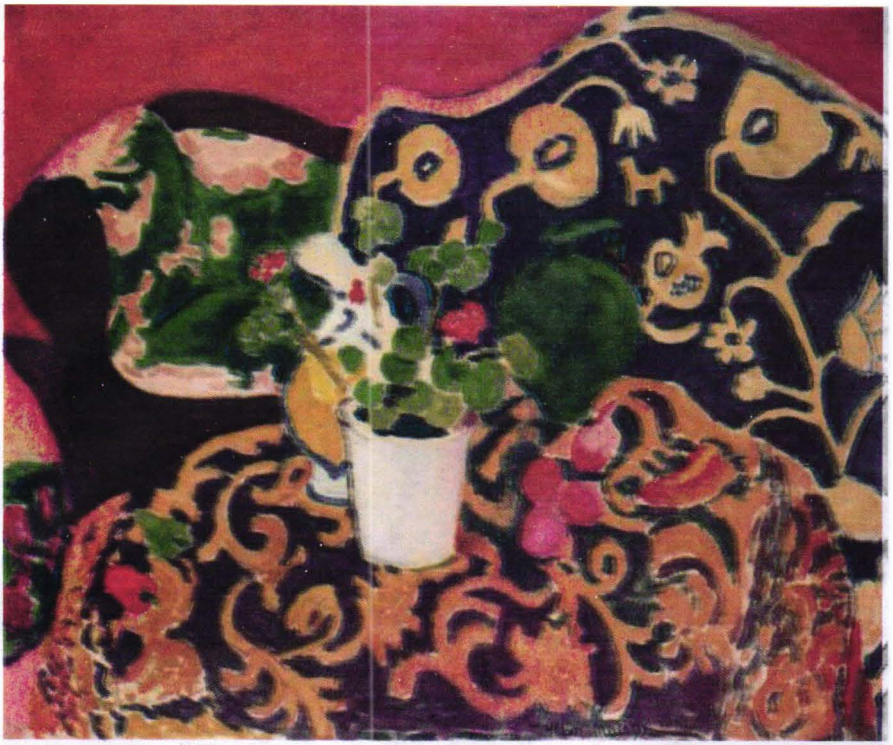

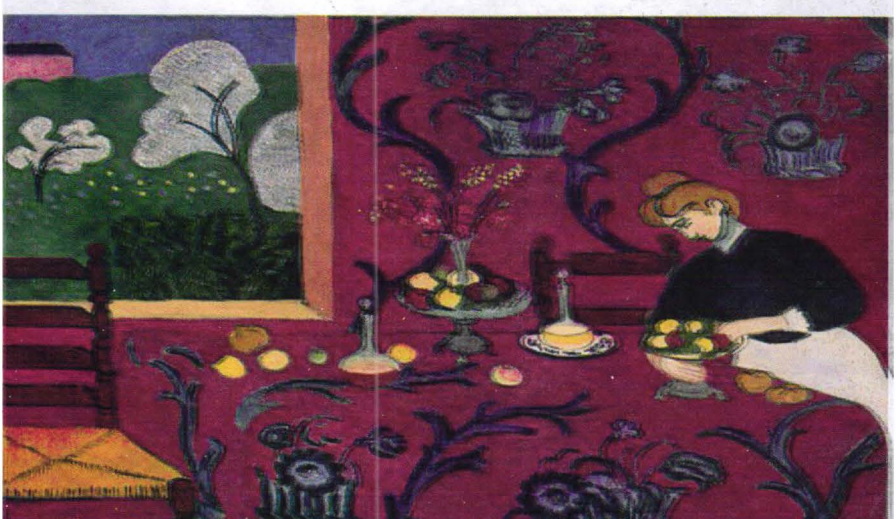

বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী অরিমাতিসের শিল্পকর্ম

www.pathagar.com

ভ্যাঙগগ এর বিখ্যাত শিল্পকর্ম সূর্যমুখী

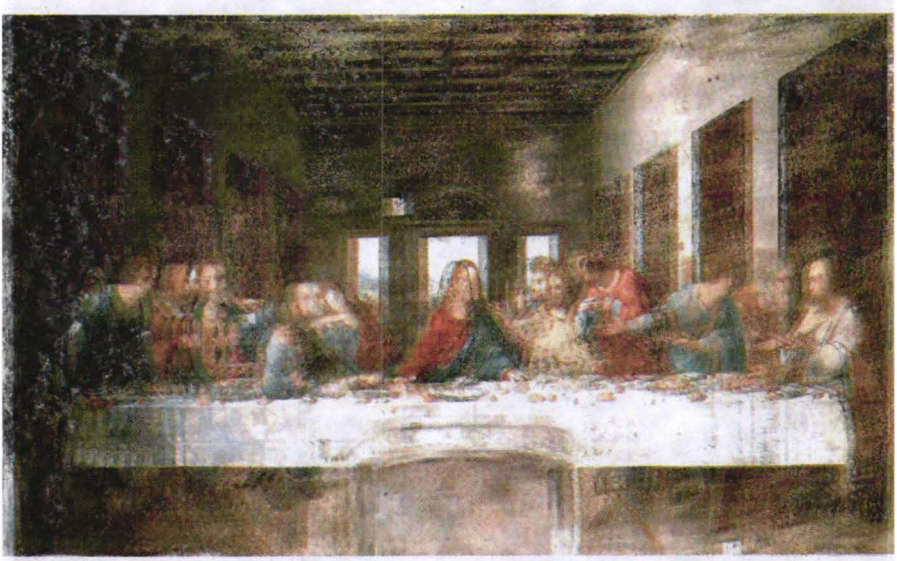

ম্যাইকেল এ্যাঞ্জেলোর শিল্প লাষ্টসাফার

www.pathagar.com

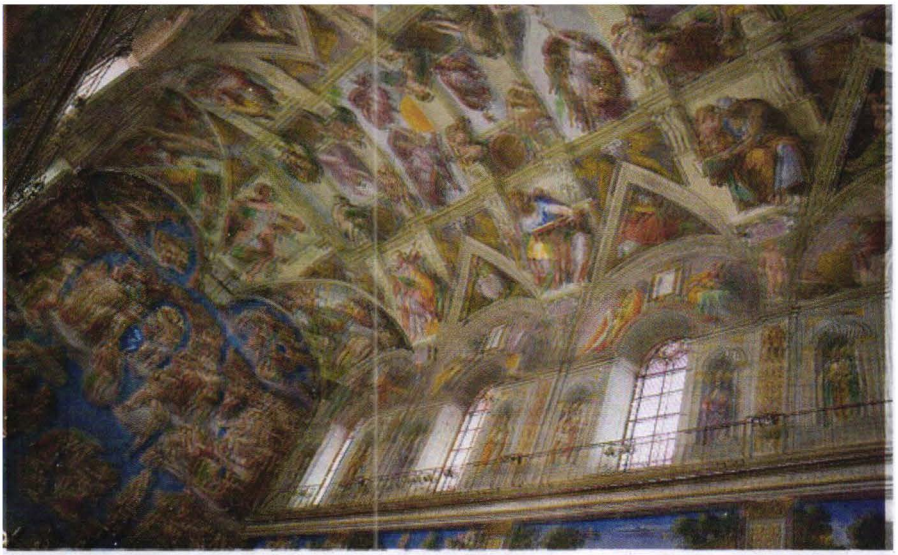

সিসতিন চ্যামপেলে ম্যাইকেল এঞ্জেলোর বিখ্যাত সাদ চিত্র

www.pathagar.com

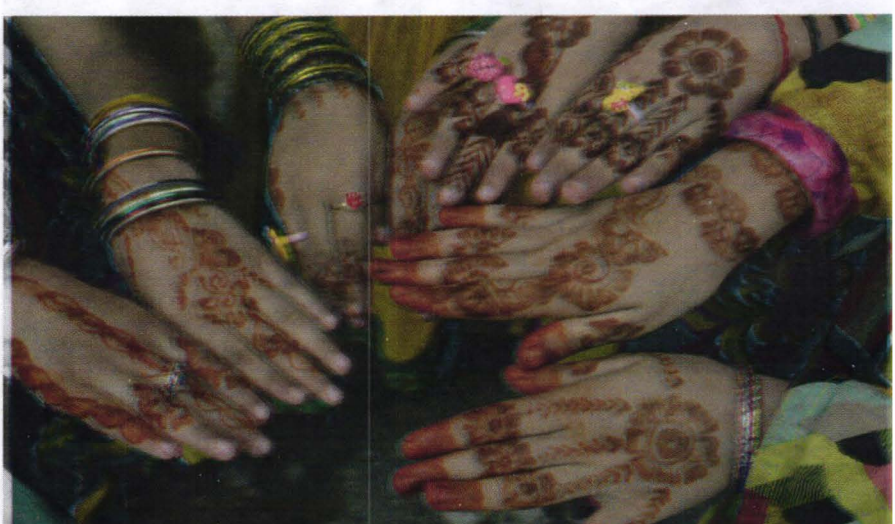

ঈদু ফিতর -এ মুসলমান মেয়েদের মেহদী উৎসব

www.pathagar.com

মাহে রমযান মাসে ইফতারের দৃশ্য

প্রানী ঢাকায় ঈদের শুভাযাত্রা

www.pathagar.com

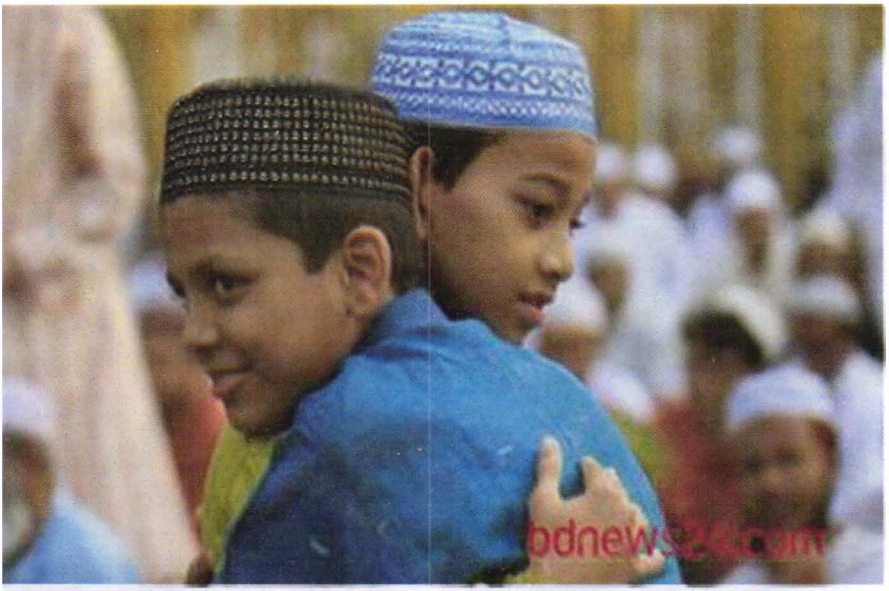

মুসলমানদের ঈদ উৎসব

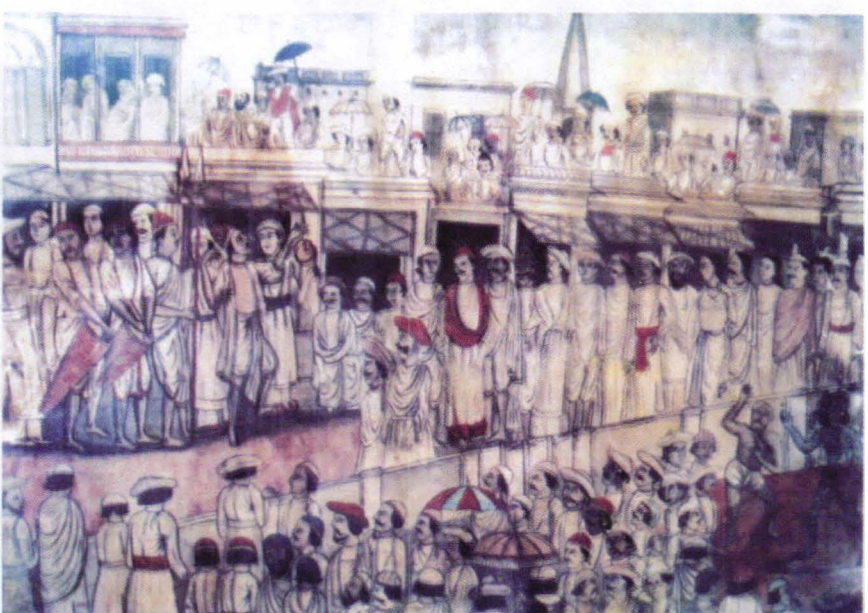

ঢাকায় ঈদের শুভাযাত্রা

www.pathagar.com

শিয়াদের তাজিয়া মিছিল

www.pathagar.com

১ বৈশাখের শুভাযাত্রা

www.pathagar.com

দুর্গাপুজা

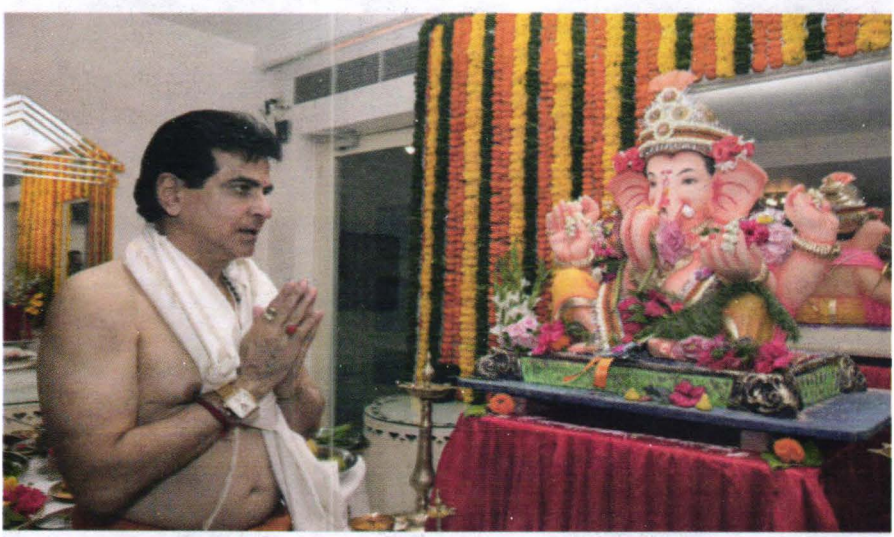

পূজার দৃশ্য

www.pathagar.com

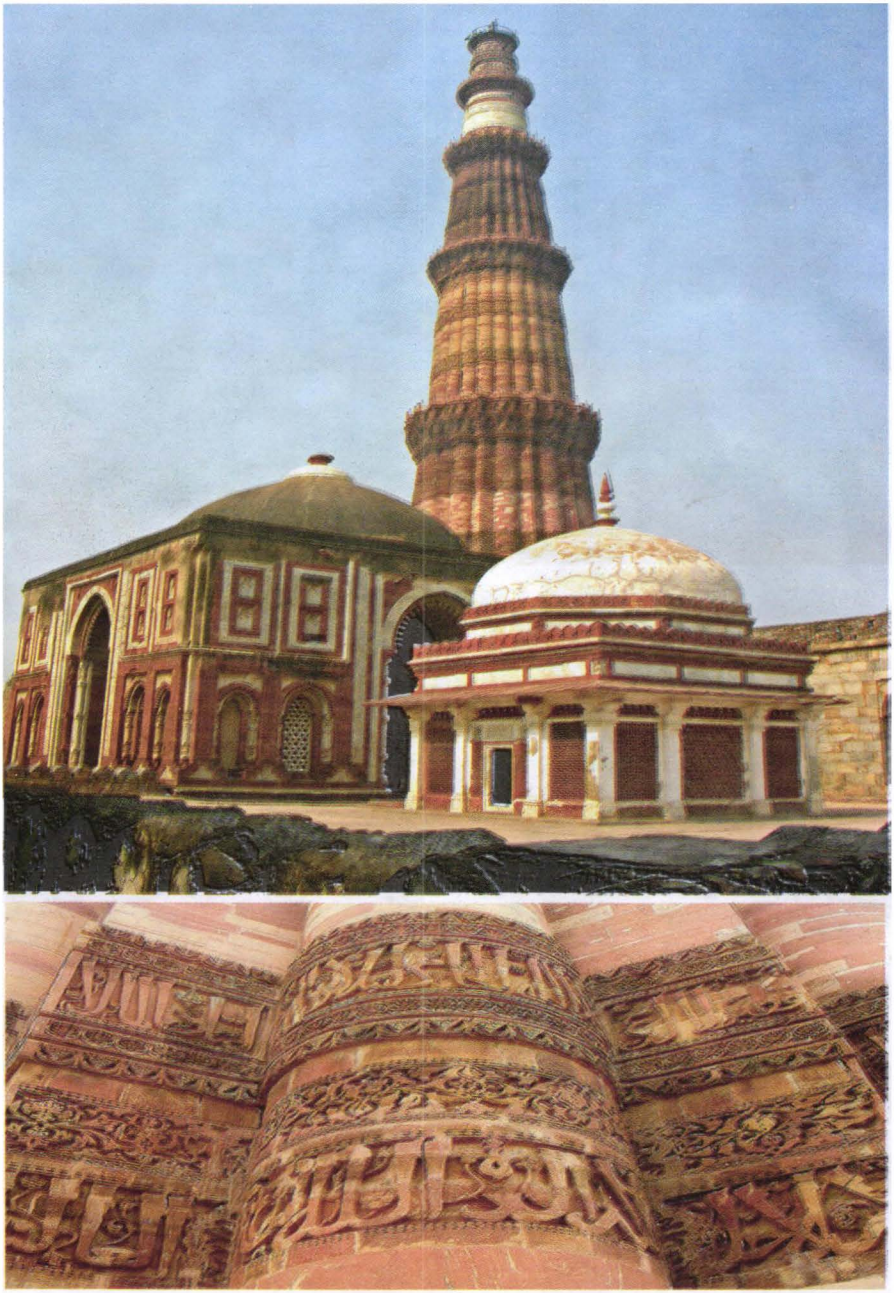

কুতুব মিনার

www.pathagar.com

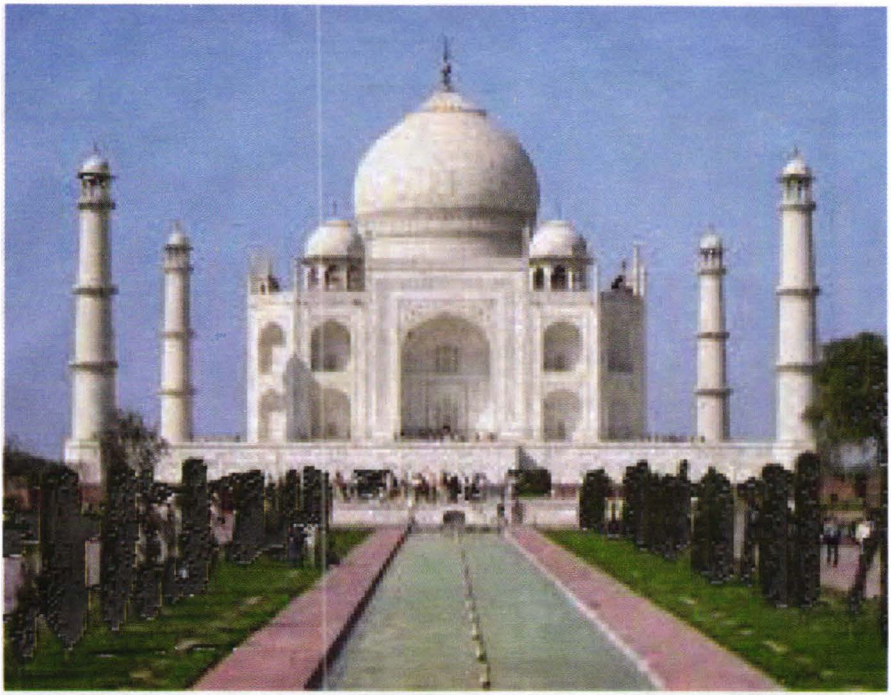

মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন আগ্রার তাজমহল

কুব্বাতুস সাকরা

www.pathagar.com

তাজিয়া শুভাযাত্রা

দেওয়ানী আম

www.pathagar.com

ইব্রাহীম মন্ডল

জন্ম ১৯৫৮ সনে মোমেনশাহী জেলার গফরগাঁও উপজেলার পোড়াবাড়িয়া গ্রামে। পিতা মরহুম আব্দুল বারী মন্ডল, মাতা আছিয়া বেগম।

১৯৮৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে (ড্রইং এণ্ড পেইন্টিং) মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

ছবি, কার্টুন, কবিতা এই তিনটি শিল্প মাধ্যমের প্রতিই তার ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড ভালবাসা ও আগ্রহ, যা তাকে এই মাধ্যমগুলোতে কাজ করতেও উৎসাহিত করেছে।

ইব্রাহীম মন্ডল খ্যাতিমান কার্টুনিস্ট, ক্যালিগ্রাফার, চিত্রশিল্পী, কবি ও শিল্পতাত্ত্বিক। একটি সুন্দর শোষণ-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে শিল্পের এই মাধ্যমগুলোতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সমাজের কুৎসিত অপশক্তির মুখোশ উন্মোচন, শাসকদের সমালোচনায় এবং কার্টুনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, নতুন কার্টুনিস্ট তৈরির উদ্দেশ্যে মাসিক কার্টুন পত্রিকা 'চাবুক' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। কার্টুনের মাধ্যমে তিনি সমাজের শোষণ, নিপীড়ন, যাবতীয় অসঙ্গতি ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষধর্মী কার্টুন এঁকে চলেছেন। দৈনিক সংগ্রাম, ছাত্র সংবাদ, কিশোর কণ্ঠ, সাপ্তাহিক ঝানডা, সাপ্তাহিক বিক্রম, গণমত, দৈনিক মিল্লাতসহ অনেক পত্রিকাতেই তাঁর কার্টুন ছাপা হয়েছে। দেশে-বিদেশে কার্টুন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ছাড়াও বসনিয়ায় মুসলিম নির্যাতন, আফগানিস্তান ও ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে ২ টি কার্টুন প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। যা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

www.pathagar.com

ইব্রাহীম মন্ডল গতানুগতিক শিল্প ধারায় ভেসে যাননি। বাংলাদেশে চিত্রশিল্পে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। তিনি বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি আন্দোলনের উদ্যোক্তা, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১১টি প্রদর্শনী কমিটিরই আহ্বায়ক। এ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে ২টি একক সহ ২৬টি যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০১ সালে ইরান সরকারের আমন্ত্রণে নবম আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। দেশে-বিদেশে ২৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সংগ্রহশালা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে তার শিল্পকর্ম রয়েছে। ক্যালিগ্রাফিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ২০০১ সালে স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ, জাতীয় প্রেস ক্লাব লেখক সম্মাননা পদক-২০০৮ ও ২০১১ সাহিত্য সংস্কৃতি পদক ২০১০ পুরস্কার পান।

ইব্রাহীম মন্ডল শুধু আন্তর্জাতিক ভাষার বিমূর্ত কবিই নন, শুধু রং -এর ভাষায়ই তুলির আঁচড়ে প্রকাশ করেননি, অক্ষর, শব্দ, ছন্দ, অলংকারেও প্রকাশ করে তোলেন।

ইব্রাহীম মন্ডল একজন নির্ভতচারী অন্তরাল প্রিয় কবি। তার কাব্যের চিত্রকল্প, অলংকার, তাকে বড় কবি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তিনি ঐতিহ্য-সচেতন, শিল্প-সচেতন, ছন্দ-সচেতন কবি। ইব্রাহীম মন্ডল ছবি আঁকায় যেমন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি কবিতার মধ্যেও। তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিচ্ছন্ন, প্রকৃতি ও দেশপ্রেম সমন্বয়ে তিনি শব্দের ভান্ডার গড়ে তুলেছেন। তাঁর ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মানবতাবোধে এক ধরনের নতুনত্বের স্বাদ রয়েছে। পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত শিল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখছেন।

বর্তমানে তিনি একটি জাতীয় দৈনিকে আর্টিস্ট ও কার্টুনিস্ট হিসেবে কর্মরত। জাতীয় প্রেস ক্লাব ও বাংলা একাডেমির সদস্য।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com